গুডবাই সান্তিয়াগো

গুডবাই সান্তিয়াগো

সাইদ সামসুল করীম

গুডবাই সান্তিয়াগো
সাইদ সামসুল করীম
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব: লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: শিল্পী আজওয়াদ আখনাফ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ৩০০ (তিনশত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৯৯৯৪-৫-৪
ISBN: 978-984-99994-5-4

Goodbye Santiago by Sayed Sasmsul Karim, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025, Copy Right: Writer, Cover design: Azoad Akhnaf, Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 300/- (Three Hundred Taka Only). ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/ ফোনে অর্ডার : *01611-913214*

উৎসর্গ

ফারহানা জামান মুক্তি

আমার প্রিয়তমা পত্নী যিনি আমার
এগিয়ে যাওয়ার পথের অনুপ্রেরণা।

প্রসঙ্গকথা

সুজনপুর। অতি সাধারণ একটা গ্রাম। শতভাগ কৃষক পরিবার। ফসল ফলানো তাদের প্রধান কাজ। বিত্তবানদের বাড়িতে হারিকেনের আলো জ্বললেও অধিকাংশ বাড়িতে জ্বলে কুপি বাতি। রাতের আঁধার দূর করতে সারা গ্রামে ছুটে বেড়ায় হাজার হাজার জোনাকী পোকা। রাতের নিরবতাকে ভাঙতে ঝিঁঝি পোকার একটানা ঝিঁঝি শব্দ সুজনপুরকে কখনই নীরব থাকতে দেয় না। রাত হলে শিয়ালগুলো লোকালয়ে চলে এসে হুক্কাহুয়া ডাকে।

গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নদী ভাইর। এমনি একটা ঘোরতর মফস্বলের প্রান্তিক কৃষক পরিবারে জন্ম আবু বকরের।

দীর্ঘ ইংরেজ শাসনে বাংলার সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে অবক্ষয়। নৈতিক অবকাঠামো ও শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ, সম্পদ পাচার, মুদ্রার অপ্রতুলতা, রাজস্ব ব্যবস্থায় অনিয়ম, অত্যাচার, সামাজিক ভিত্তিকে ভেঙে ফেলেছে। দায়িত্বহীন শাসন প্রক্রিয়ায় সুস্থ মনীষার মৃত্যু ঘটেছে। পশ্চাৎপদ শিক্ষার কারণে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ বৃটিশ শাসন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতে না পারায় পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা, চিন্তার বিকাশ সাধনে আর্থসামাজিক উন্নয়নে একীভূত হতে পারেনি।

ইউরোপীয় ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন পাঠ করে স্বদেশ ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদার গণতান্ত্রিক মূলবোধে উদ্বুদ্ধ হতে পারেনি। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ এবং ইংরেজ শাসন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ব বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় জাগ্রত হয়েছিল মাত্র। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে পাশ্চাত্য ভাবধারায় নিজেকে তৈরি করতে পারেনি। অপরদিকে ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্য হিন্দু সম্প্রদায়কে ইংরেজদের স্থানীয় শক্তিতে পরিণত করে। ইংরেজ শাসনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে হিন্দু সম্প্রদায় উত্তর উত্তর উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। মৌলিক চিন্তার পার্থক্য দূর করতে না পারায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে মুসলিম সম্প্রদায় পিছিয়ে পড়ে।

হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায় দীর্ঘদিন সহাবস্থান করে স্বতন্ত্রবোধকে দূরীভূত করেছিল মাত্র, সাম্প্রদায়িক বৈষম্যকে দূর করতে পারেনি। ইংরেজ তোষণ পূর্ব বাংলায় সৃষ্টি করে হিন্দু জমিদার শ্রেণি। জমিদারগণ ভূমি বন্দোবস্ত নিয়ে রাজস্ব আদায়ের সামান্য অংশ ইংরেজ কোম্পানিকে পরিশোধ করে সিংহভাগ ব্যয় করে বিলাসী জীবন যাপনের প্রয়োজনে।

প্রবহমান এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই পূর্ব বাংলায় বেশ কিছু জমিদার সৃষ্টি করেন প্রজাহিতৈষী আখ্যান। তাদের মধ্যে অন্যতম জমিদার কালিকুমার সেন চৌধুরী। শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন জুনিয়র হাই স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, সুপেয় পানির জন্য খনন করেন সরোবর। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকের ফসল বিনষ্ট হলে খাজনার পুরোটাই করেন মওকুফ।

এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ইংরেজ শাসনের দুর্বিষহ অন্যায় অত্যাচার, সামাজিক অবক্ষয় যখন চলমান সেই সময়কার।

জীবনের শেষভাগে এসে ভাবলাম ভালোবাসার মানুষটিকে পাওয়ার প্রবল বাসনা নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি জমানো এক মধ্যবিত্ত পরিবারের নিরীহ যুবকের দুর্নিবার পথচলার গল্পটা লিখে যাওয়া প্রয়োজন। তা না হলে বিংশ শতাব্দীর এক অসম ভালোবাসার গল্পটা সকলের কাছে অজানাই থেকে যাবে। উপন্যাস বা গল্প যাই বলি এটা লেখার অনুঘটক ছায়ানীড়ের প্রাণপুরুষ অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান। প্রেরণা আমার স্ত্রী ফারজানা জহান মুক্তি, যিনি আমার জীবনের সহযাত্রী।

লেখক

আমার বাবজান মো. জমির উদ্দিন সরকার কালিকুমার সেন চৌধুরীর জমিদারী দেখাশোনা করেন। প্রতিদিন ভোরবেলা চলে যান। ফেরেন বেশ রাতে। আমি আর আমার মা বাবজানের জন্য বেশ রাত অবধি অপেক্ষা করি। বাবজান আসার পর একসাথে খাওয়া দাওয়া করি। বাবজান বাড়ি ফিরেই আমাকে ডাকেন বাজান আসো খাওয়া দাওয়া করি। আজও বাবজান বেশ দেরীতে ফিরলেন। আমাকে ডেকে বললেন, বাবা আবুবকর লেখাপড়ার কি অবস্থা? আমি বললাম, বাবজান সামনে ম্যাট্রিকুলেট পরীক্ষা। পরীক্ষা দেয়ার জন্য সদরে যেতে হবে।

বাবজান বললেন, বিদ্যার জন্য মানুষ সুদূর চীন দেশে যায়। থানা সদর আর কতদূর। আমার কথা ভাবো, এখানে কোনো মাদ্রাসা ছিলো না, আমি ভারতের দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেছি। থাকতাম এক কৃষক পরিবারে। তাদের জমিতে হালচাষ, বীজ রোপণ, চারা রোপণ, ফসল কাটা, ফসল মাড়াই, ফসল বিক্রির বিনিময়ে খাবার মিলতো। তোর দাদাজান মারা যাওয়ার পর আমাকে ফিরে আসতে হয়। এজন্য উচ্চ শিক্ষা শেষ করতে পারি নাই। আমি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারলেও তোর লেখাপড়ার সব চেষ্টা আমি করবো। বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করলে উন্নত বিশ্ব সম্পর্কে জানা যাবে না। এজন্য দেশের বাইরে যেয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

আমি বাবজানকে বললাম, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়ার সময় কোথায় থাকবো। বাবজান বললেন, নায়েব বাবুর এক ভাই থাকেন সদরে। নায়েব বাবু বলেছেন তুই সেখানে থেকে পরীক্ষা দিবি। খাওয়া দাওয়ার পর আমি আমার ঘরে চলে আসি। আমাদের বাড়িতে তিনটা বড় বড় টিনের ঘর। উত্তরের ঘরে থাকেন বাবজান আর মা। মাঝখানের ঘরে থাকি আমি। দক্ষিণের বাংলোঘরে থাকেন কাদের মিয়া। আমাদের জমিজমা, হালের গরু দেখাশোনা করেন।

ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে বাবজান কাদের মিয়াকে বললেন, 'আবু বকর আজ পরীক্ষা দেয়ার জন্য সদরে যাবে। রাধা গোবিন্দ বাবুর বাড়ি। তুই সকাল সকাল ওকে নিয়ে যাবি। যাওয়ার সময় পরীক্ষা দেয়ার সব জিনিসপত্র সাথে নিতে হবে। খেয়াল করে নিয়ে যাবি।'

আমার মা মোমেনা খাতুন সকাল বেলাতে আমার সব কাপড় চোপড় গুছিয়ে দিলেন। আমি আমার বইপত্র, খাতা, কলম, কালি, পেন্সিল, জ্যামিতি বক্স পরীক্ষার প্রবেশপত্র গুছিয়ে নিলাম। জিনিসপত্র গোছানোর পর মাকে বললাম, আসি। মা চোখের পানি ছেড়ে বললেন, 'গ্যাদা দেইখা শুইনা থাকিস। খাওয়া দাওয়া ঠিকমত করিস। ভালো কইরা পরীক্ষা দিস।' মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। কাদের মিয়া আমার সামনে আমি পেছনে।

আমি যখন থানা সদরে রাধা গোবিন্দ বাবুর ব্যাড়িতে পৌঁছলাম তিনি তখন বাড়িতেই ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, 'আবু বকর তোমার বাবজান আমাকে তোমার কথা বলেছেন। তুমি ভালো ছাত্র। ভালোভাবে পরীক্ষা দাও এটা আমি চাই।' এরপর তিনি তার স্ত্রী শ্রীমতি আরতি সাহাকে ডেকে বললেন, 'শোন আবু বকর খুব ভালো ছাত্র। বড়দা ওকে পাঠিয়েছেন, এখানে থেকে পরীক্ষা দেবে। ওর যেন কোনো অযত্ন না হয়।' শ্রীমতি আরতি আমাকে বললেন, 'শোনো তোমার জন্য বৈঠকখানায় থাকার ব্যবস্থা করেছি। ওখানে টেবিল চেয়ার রাখা আছে। পড়ালেখা করবে। তোমার দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়েছি অরুণ বাবুকে। তিনি আমাদের ব্যবসার গদিতে বসেন। খাওয়া দাওয়া করবে আমাদের সাথে।' আমি আচ্ছা বলে বৈঠকখানায় চলে গেলাম। আমার পিছনে পেছনে এলো রাধা গোবিন্দ বাবুর মেয়ে নিরুপমা, বয়স ১০-১১ বছর হবে, আমার সামনে এসে বলল, 'দাদা আমি প্রাইমারি পাস করে হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছি। আমি অংকে খুব কাঁচা, আমাকে অংক শেখাবে?' আমি আচ্ছা বলে বৈঠকখানার চেয়ারে বসলাম। নিরুপমা একসময় চলে গেলো।

বৈঠকখানার ঘরটা বেশ বড়। মাঝখানে বড় একটা কারুকার্যময় খাট। মাঝে একটা টেবিল। টেবিলের ঢাকনা মার্বেল পাথরের। টেবিলের পাশে একটা কারুকাজ করা চেয়ার।

আমি আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে পড়তে বসলাম। সন্ধ্যায় অরুণ বাবু একটা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। রাতে খাওয়ার ডাক পেলাম।

খাওয়ার টেবিলটি বেশ বড়। টেবিলের ওপরের ঢাকনা শ্বেতপাথরের। বেশ বুনিয়াদি ভাবধারার লোক উনারা। রাধা গোবিন্দ বাবুর স্ত্রী আরতি সাহা আমাকে খাবার দিতে দিতে বললেন, 'আবু বকর, তোমার যা কিছু খেতে ইচ্ছে হয় আমাকে বলবে, আর আমাকে মাসিমা বলে ডাকবে। একজন ভালো ছাত্র আমার এখানে থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে এটাই আমার ভালো লাগছে।'

আচ্ছা বলে খাওয়া দাওয়া করে বৈঠকখানায় চলে এলাম।

দেখতে দেখতে আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলো। আমার বাড়ি ফেরার সময় হলো। আমি মাসিমাকে বললাম, মাসিমা, আমার পরীক্ষা শেষ, আজ বাড়ি ফিরে যাবো। মাসিমা বললেন, ক'টাদিন এখানে ছিলে বাড়িটা বেশ আনন্দে ভরে উঠেছিলো। নিরুপমা বলল, দাদা তোমাকে আমার খুব মনে পড়বে মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে এসো। আমি আচ্ছা বলে বৈঠকখানায় যেয়ে আমার সব জিনিপত্র গুছিয়ে নিলাম। গোছানোর পর দেখলাম মাসিমা আমার পাশে দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, 'আবু বকর তুমি একা যেতে পারবে না। অরুণ বাবু তোমাকে পৌঁছে দেবে।' বড় লোকের যেই কথা সেই কাজ। আমি অরুণ বাবুর পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করলাম।

যখন সুজনপুর পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা সমাগত। গাছে গাছে পাখির কিচির-মিচির শুনে বুঝতে পারলাম ওদের ঘরে ফেরার সময় এসেছে। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা ভাইর নদীর পানি কমতে শুরু করেছে। খেয়া নৌকা অল্প সময়ের মধ্যে এপার ওপার করতে পারে। বাড়ি ফিরে দেখি মা বৈঠকখানার পাশে আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। আমি অরুণ বাবুকে বৈঠকখানায় বসতে দিয়ে মার ঘরে যেয়ে কয়েকটা নারকেলের নাড়ু এনে অরুণ বাবুকে দিলাম। অরুণ বাবু নাড়ুগুলো খেয়ে চলে গেলেন।

বাবজান রাতে ফিরে আমাকে বললেন, 'বাবা আবু বকর পরীক্ষা ক্যামন হইছে? পাস করবা তো।' আমি বললাম, 'ভালো। পাস করবো।'

দেখতে দেখতে আমার পরীক্ষার ফল বের হলো। আমি আমার সেন্টারে সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করলাম। আমার রেজাল্ট হওয়ার পর বাবজান আমাকে কালি কুমার সেন চৌধুরীর বাড়ি নিয়ে গেলেন। এর আগে আমি কখনও জমিদার বাড়ি দেখি নাই। বাড়ির সদর দরজার ওপারে দুই পাশে দুইটা বাঘের মূর্তি। বিশাল জানালার লাল, হলুদ, নীল, সবুজ রঙের কারুকাজ করা কাচ দিয়ে ঢাকা। দরজার পাল্লাগুলো কারুকাজ করা। দরজার ওপরের অংশ কাচের তৈরি। কাচে নৃত্যারত রমণীর ছবি। অন্দর মহল, ঝুলন দালান, ঘোড়াশালা, হাতিশালা, নাট মন্দির। শুধু দালান আর দালান আর অসংখ্য পাইক পেয়াদা।

বাবজান এখানে চাকরি করেন ভাবতে ভালো লাগছে। কালি কুমার সেন চৌধুরীর কাছে যখন বাবজান আমাকে নিয়ে গেলেন। তিনি পকেট থেকে দশ টাকা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'This is your Gift, because I have seen a Matriculate person.'

তিনি আরো বললেন, 'তুমি অনেক ভালো রেজাল্ট করেছো। এজন্য আমি খুশি। তোমার বাবজান তোমার পড়ালেখার ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন। আমি কলকাতার ভালো কলেজে তোমায় ভর্তির ব্যবস্থা করেছি। তুমি কলকাতায় আমার বড়দার বাড়িতে থাকবে। আমার মেয়েকে পড়াবে এবং নিজে লেখাপড়া করবে। তোমার বাবজান সামনের শনিবার তোমাকে বিনানয়ের ঘাটে কলকাতার স্টিমারে তুলে দেবে। আমার দাদার ছেলে-মেয়ে নাই। এজন্য তিনি আমার মেয়েকে তার বাড়িতে রেখে কলিজিয়েট স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। কলকাতায় পড়ালেখার অনেক সুবিধা। পড়ালেখা না করারও সুযোগ আছে। যে পারে সে নিজেকে তৈরি করে। তোমার পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ আছে, আশা করি তুমি ভালো করবে। দাদাকে তোমার বিষয়ে বলেছি। তোমার কোন অযত্ন সেখানে হবে না।

বাড়ি ফিরে মাকে সব বললাম। মা আমাকে কিছুতেই কলকাতা যেতে দেবেন না। বাবজানকে বললেন, দেখেন আবু বকর আমার একমাত্র ছেলে। আমার চোখের মনি। আদরের ধন। আমি ওরে ছাড়া একা একা থাকতে পারবো না। বাবজান বললেন, 'দেখো, পড়ালেখা না করলে এই দুনিয়ার সম্পর্কে কোনো কিছু জানা যাবে না। আমার তেমন জমি জায়গা নাই। লেখাপড়া না করলে আবু বকর ভালো চাকরি পাবে না। যে কোনোভাবেই হোক ওর পড়ালেখা করা প্রয়োজন। জমিদার বাবু ওর পড়ালেখার আগ্রহের কথা শুনে তিনি কলকাতায় থাকার ব্যবস্থা করেছেন। আবু বকর শিক্ষিত হলে ভালো চাকরি পাবে। ওর কোনো অভাব থাকবে না।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও মা রাজী হলেন।

সপ্তাহটা কেন জানি অতি দ্রুত চলে গেলো। বাবজান পরদিন শনিবার সকালে উঠে আমাকে তৈরি হতে বললেন। আমার মা মোমেনা খাতুনের চোখ পুরো সপ্তাহটাই ভেজা ছিলো। যাবার সময় চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলেন না। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বাবা দেইখা শুইনা থাইকো। ঠিকমত খাবার খাইও। পড়ালেখা মনোযোগ দিয়া কইরো। ভোরের লঞ্চে আমরা বিনানয়ের ঘাটে পৌঁছালাম। সেখানে অনেক বড় স্টিমার দাঁড়িয়ে আছে। স্টিমারের ইংরেজ সারেং সাদা পোশাক, ক্যাপ পরে স্টিমারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবজান আমাকে স্টিমারে তুলে দিয়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবজানকে আমি কোনোদিন কাঁদতে দেখিনি। আজ বাবজানের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে দেখলাম। কলকাতার স্টিমারকে ঘাটে দাঁড়িয়ে দৃষ্টির আড়াল হওয়া পর্যন্ত বাবজান স্টিমার ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কলকাতা যাওয়ার স্টিমার বেশ পরিপাটি। বসার জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা। যারা বেশি দামের টিকিট করেছেন তাদের জন্য কেবিন। খাবার পরিবেশনের জন্য বেশ বড় লাউঞ্জ। বাড়তি কোন ঝামেলা নাই বললেই চলে। স্টিমারটি ছুটে চলেছে। পেছনে পড়ে রয়েছে যমুনা, পদ্মা, গঙ্গা, ভাগিরথি এরপর বিশাল জলরাশি বঙ্গোপসাগর।

কলকাতা স্টিমার থেকে নামার পর আমি কি করবো ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি স্টিমার ঘাটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় একজন অবাঙালি আমার পাশে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোম পূর্ব বাংলাছে আয়া? কিয়া হায় তোমহারা নাম?' আমি আমার নাম বললাম। তিনি বললেন, 'চালিয়ে মেরা সাথ। বৃন্দাবন সেন হামকো ভেজা। মেরা নাম সুখলাল।' স্টেশনের পাশে দাঁড়িয়েছিল অনেক টানা গাড়ি। পেছনে সিট। চাকার দুই পাশে দুইটা হাতল লাগানো অধিকাংশ গাড়ি অবাঙালি চালক টেনে নিয়ে যান।

সুখলাল একজন চালককে বললেন, 'পার্কস্ট্রিট যায়েগা।' হ্যাঁ সূচক উত্তর পাওয়ার পর সুখলাল আমাকে নিয়ে টানা গাড়িতে উঠলেন। গাড়িতে উঠে আমি কলকাতা শহরকে আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলাম। রাস্তার পাশে বড় বড় দালান। রাস্তায় প্রচুর গাড়ি। লোকজনের মধ্যে একধরনের ছুটে চলার প্রতিযোগিতা। শহরের ভেতরে যাওয়ার পর দেখলাম ট্রাম বেশ ছন্দময় গতি নিয়ে কলকাতার রাস্তা পার হচ্ছে। শিয়ালদা স্টেশনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হলো কলকাতার সব লোক ট্রেনেই যাতায়াত করে। লোকে লোকারণ্য। রাস্তায় রাস্তায় আলোর ঝলকানি।

দেখতে দেখতে পার্কস্ট্রিটের একটা দোতলা বাড়ির সামনে আমাদের টানা গাড়ি এসে থামলো। সদর দরজায় আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন মাঝ বয়সী এক রমণী। বেশ পরিপাটি পোশাক। ধবধবে গায়ের রঙ, কপালে সিঁদুর। হাতে সোনার বালা। পাশে দাঁড়িয়ে তেরো চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ে। গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। পরনে স্যালোয়ার কামিজ, ছিপছিপে গড়ন, গভীর দুটি কালো চোখ। গাড়ি থেকে নামতেই আমার জিনিসপত্র বাড়ির কাজের লোকেরা তুলে নিয়ে গেলো। মাঝ বয়সী মহিলা আমাকে অনেকক্ষণ পরখ করে বললেন, 'বাবু বলেছেন, আজ তুমি আসবে। তুমি আমাকে কাকিমা বলে ডাকবে।' ইনি বাবুর ছোট ভাই জমিদার কালিকুমার সেন চৌধুরীর মেয়ে। এখানে থেকে পড়ালেখা করে। নাম সুস্মিতা।

আমি কাকিমাকে অনুসরণ করে বাড়ির ভেতরে গেলাম। বাড়ির বাহিরটা তেমন পরিপাটি না হলেও ভেতরটা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সেগুন কাঠের আসবাবপত্র, চীনা মাটির তৈজসপত্র, খেলনা, বড় বড় ঝাড়বাতি। আভিজাত্য প্রকাশের কোন ঘাটতি নেই বললেই চলে। আমার জন্য আগে থেকেই জলখাবারের ব্যবস্থা ছিলো। খাওয়ার পর কাকিমা বললেন, তোমার জন্য দোতলায় কোণার ঘরটা তৈরি করা হয়েছে। সেখানেই থাকবে। তোমার দেখাশোনা করবে সুখলাল। কোনো প্রয়োজন হলে সরাসরি আমাকে কিংবা সুস্মিতাকে বলবে। আজ আর

কোনো কথা নয়, অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছো এখন বিশ্রাম কর। কাল কথা বলব। কাকিমার কথা শুনে আমি দোতলার কোণার ঘরটিতে চলে আসলাম।

সুজনপুর গাঁয়ের মতই কলকাতার আকাশ তারায় তারায় ভরা। সন্ধ্যার পর আশেপাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসে হারমোনিয়ামের শব্দ আর সা-রে-গা-মা-পা চর্চার আওয়াজ। নেই ঝিঁঝি পোকার একটানা শব্দ, পাখির কূজন, নদীর কলরব।

রাত বাড়তেই শোনা যায় ফোর্ড উইলিয়াম কোম্পানির প্রাইভেট কারের বিকট হর্ন বাজানোর প্রতিযোগিতা। মনে হয় উচ্চবিত্তের অপরিমিতি বোধের সীমাহীন অহংকারের আত্মপ্রকাশ। রাস্তায় রাস্তায় জ্বলতে থাকে মিউনিসিপালিটির বৈদ্যুতিক বাতি। মন্দিরে মন্দিরে কাসোর ঘণ্টা, শাকের উলু ধ্বনি। একটু পরপর সমস্বরে হরে রামো হরে কৃষ্ণ রামো রামো হরে কৃষ্ণ হরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে বন্দনা গাঁথা। কলকাতা শহরের হতচ্ছাড়া জৌলুস দেখে মনে হলো আমি কোন এক অজানা জনপদে এসে হাজির হয়েছি। যেখানে নেই নদীর কলরব। পালতোলা নৌকা, মাঝির ভাটিয়ালি গান, গভীর রাতের শিয়ালের হুক্কা-হুয়া ডাক। কলকাতাকে মনে হচ্ছে কোন এক অজানা সংস্কৃতি চর্চার প্রতিযোগিতায় এখানকার মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যে কোনো ভাবেই হোক ইউরোপীয়ান ধ্যান ধারণা পোশাক পরিচ্ছদে, কথাবার্তায় নিজেকে ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হিসেবে তৈরি করতে হবে।

একরাতের ব্যবধানেই সুজনপুরকে আমার একান্ত আপন বলে মনে হলো। এই কলকাতায় আমিও কি আমার স্বকীয় মূল্যবোধ, আবেগ উচ্ছ্বাস হারিয়ে ফেলবো? ভাবতে ভাবতে এক সময় বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিলাম। দীর্ঘ ভ্রমণ ক্লান্তিতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে সুখলাল এসে আমাকে ডাকলেন, বাবু, মাতাজি আপকো বুলায়া। নাস্তাকে লিয়ে। আমি সুখলালকে অনুসরণ করে বৈঠকখানার নাস্তার টেবিলে বসলাম। টেবিলের উল্টাপাশে কাকিমা আর সুস্মিতা বসা ছিলো। কাকিমা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ঘুম হয়েছো তো?' আমি জি বলে উত্তর দিলাম। এরপর কাকিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাড়িতে কে কে আছে?' আমি বললাম, 'আমার বাবজান আর মা।' এরপর কাকিমা বললেন, নাস্তা কর তোমার

যেটা পছন্দ। টেবিলের ওপর নানা রকম ফলের জুস, ভাজি, লুচি, মিষ্টি, সেমাই। আমি খেতে খেতে কাকিমাকে বললাম, আমি মেডিসিন নিয়ে পড়তে চাই। কাকিমা বললেন, এজন্য তোমাকে এফএ পাস করতে হবে। সেন্ট জেভিয়ার্ড কলেজ বিজ্ঞান পড়ার জন্য ভালো। কলেজের প্রিন্সিপাল গোবিন্দ কুমার মজুমদার সুস্মিতার বড় কাকাবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি প্রিন্সিপাল বাবুকে বলে রেখেছেন, তোমার জন্য একটা সিট সংরক্ষণ করা আছে।

খাওয়ার টেবিলে আমার পাশে বসেছিল সুস্মিতা। বয়স কম হলেও বেশ আত্মপ্রত্যয়ী। সীমাহীন অভিব্যক্তি চোখেমুখে। স্বল্পভাষী। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমাকে কি বলে ডাকবো, দাদা বলবো নাকি, মাস্টার মশাই?

আমি বললাম, আমি তোমার থেকে খুব একটা বড় হবো না। মাস্টার মশাই বললে নিজেকে অনেক বড় মনে হবে, তুমি বরং আমাকে দাদা বলবে।

কাকিমা বললেন, আবু বকর তোমার কাকা বাবু সারাক্ষণ তার ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তোমার যা প্রয়োজন আমাকে বলবে, নয়তো সুস্মিতাকে। আজ বিশ্রাম নাও। কাল সুস্মিতা তোমাকে কলকাতা শহর ঘুরিয়ে দেখাবে। নিউ মার্কেট, বড় বাজার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হাওড়া, সায়েন্স সিটি অনেক কিছু দেখার আছে। কলকাতা অনেক বড় শহর। একদিনে পারবে না। তোমাকে অনেকদিন দেখতে হবে। এখানকার লোকজন বেশ শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলে, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি সব ভাষাতেই এরা পারদর্শী। তুমি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছেলে, সহসাই সবকিছু রপ্ত করতে পারবে। এখন যাও বিশ্রাম করো।

দোতলার যে ঘরটাতে আমাকে থাকতে দেয়া হয়েছে সেই ঘরের দক্ষিণ পাশে একটা বড় জানালা। কারুকাজ করা। সম্ভবত সেগুন কাঠের। জানালার পাল্লায় রঙিন কাচ লাগানো। আলো আসা যাওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও কাচের ভেতর দিয়ে কোনো কিছু দেখা যায় না। আমি জানালা খুলে কলকাতা শহরকে দেখার চেষ্টা করলাম।

কলকাতা শহরের মানুষজনের মধ্যে একধরনের ছুটে চলার প্রতিযোগিতা। মনে হয় যে যত ছুটতে পারে সে-ই সমাজে ততবেশি সফলতা অর্জন করতে পারে।

টানা গাড়ির চালক সব সময় দৌড়ের ভঙ্গিতে ছুটে চলে। চার চাকার ফোর্ড উইলিয়াম কোম্পানির অধিকাংশ গাড়ির রঙ কালো। চলতে চলতে একটু পরপর হর্ন বাজায়। গণপরিবহন অধিকাংশ রঙ বিহীন। দুএকটা নামী দামী স্কুলের বাস আমার জানালার পাশ দিয়ে ছুটে যেতে দেখলাম। গাড়ির অধিকাংশ শিক্ষার্থীর গায়ে স্কুলের নির্ধারিত ইউনিফরম। গাড়ির নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে আছেন একজন অবাঙালি, পাশের রাস্তায় যাওয়ার সময় ডাকলেন রুক। সাথে সাথে গাড়ি থেমে গেলো। কয়েকজন অভিভাবক তাদের ছেলে-মেয়েদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। শিক্ষার্থীদের বেশ কয়েকজন ভেতর থেকে গুডবাই আওয়াজ করলো। এরপর গাড়ি ছুটে গেলো নির্ধারিত গন্তব্যে।

সকাল পেরিয়ে দুপুর হয়ে গেলো তবুও কলকাতা থামবার নামটি নেই। আজব এক শহর। ভেবে পাই না এদের কীসের এতো ব্যস্ততা। দুপুর পেরিয়ে বিকাল হতেই বাড়ির ছাদে ছাদে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা। নানা রকম রঙিন কাগজ দিয়ে তৈরি অসংখ্য ঘুড়ি কলকাতার আকাশকে দখল করে ফেললো। এরপর শুরু হলো সুতার কাটাকাটি। সুতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই অপর প্রান্ত থেকে বিজয় উল্লাস। জয়-পরাজয়ের এই খেলা চলল সন্ধ্যা অবধি।

সন্ধ্যায় সুস্মিতা আমার ঘরে এসে বলল, কি দাদা আলো জ্বালো নাই কেন? আমি বললাম, অন্ধকারে নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করছি। হঠাৎ করে মনে হচ্ছে আমি যেন কোন এক অজানায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। আমার চিরচেনা গ্রাম, নদীর কলতান, জোনাকী পোকা, ঝিঁঝি পোকার একটানা ঝিঁ ঝিঁ শব্দ হঠাৎ করেই আমার জীবন থেকে যেন বিলীন হয়ে গেছে। এক অজানা নিষ্ঠুর প্রকৃতির মাঝে আমি যেন নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলছি।

সুস্মিতা বলল, এই উপমহাদেশ এখনো ইংরেজদের শাসনে। ইংরেজদের দেয়া সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য নিজের স্বকীয়তাকে ভুলে সবাই ইংরেজদের মত করে নিজেকে তৈরি করছে। যারা পারছে তাদের জন্য ক্ষমতা এবং সম্পদ দুটোই পাচ্ছে হাতের নাগালে। তুমি সুজনপুরের মত অজপাড়াগাঁয়ে বড় হয়েছো। তবুও কত মেধাবী। নিজেকে তৈরি করতে পারলে সাফল্য তোমার হাতের নাগালে চলে আসবে। তোমার বাবা মা কত বড় স্বপ্ন নিয়ে তোমাকে অজানা শহরে পাঠিয়েছে। তুমি নিশ্চয় সে স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে?

আমি বললাম, আমাদের আর্থিক সঙ্গতি ভালো না। কিন্তু তুমি ধনাঢ্য পরিবারের মেয়ে ইচ্ছে করলেই সেরা সেরা গৃহ শিক্ষক রেখে নিজের বাড়িতে পড়তে পারো। তুমি কেন কলকাতায়? সুস্মিতা বলল, কাকিমার প্রথম সন্তান জন্মের সময় মারা যায়। দ্বিতীয় সন্তান পাঁচ বছর বয়সে জলে ডুবে মারা যায়। কাকিমা তৃতীয় সন্তান হওয়ার জন্য হাসপাতালে। আমি তখন কলকাতায় কাকির বাড়িতে।

ডাক্তার কাকাকে বললেন, এবারও আপনার মৃত সন্তান হয়েছে। জ্ঞান ফিরে আপনার স্ত্রী মৃত সন্তানের কথা জানতে পারলে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হবে। কাকা আমার মাকে বললেন, তোমার মেয়েকে ওর কাকি প্রমিলাকে দিয়ে দাও। তা না হলে ও বাঁচবে না। তোমার মেয়েকে আমরা মাথায় করে রাখবো।

সেই থেকে আমি কলকাতায় কাকির সাথে। আমার মা বড়দাকে নিয়ে পূর্ববঙ্গে যাওয়ার সময় অঝোরে চোখের জল ফেলে কাকিমাকে বলেছিলেন, 'আমার আত্মাকে তোর কাছে রেখে গেলাম। মাঝে মাঝে ওকে আমার কাছে পাঠাবি।'

এরপর আমি যখনই মায়ের কাছে যেতে চাই কাকিমা কখনও নিষেধ করে না। আমাকে সাথে করে নিয়ে যান আবার সাথে নিয়ে ফেরেন। আমার বড়দা অরবিন্দ সেন চৌধুরী দিল্লি থেকে এলএলবি করে এখন বিলেতে ব্যারিস্টারি করছেন। দাদা হয়তো বিলেতেই প্র্যাকটিস করবেন।

সুস্মিতার জীবনবোধের গভীরতায় আমি বেশ অবাক। অপরিণত বয়সেও সুস্মিতা জীবনের নানা চড়াই উতরাই সম্পর্কে ধারণা রাখে। তবুও আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার দাদা যদি বিলেতে থাকে তাহলে তোমাদের জমিদারী কে দেখাশোনা করবে?

সুস্মিতা বলল, পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জমিদারদের ঠিকানা কলকাতা। একসময় সকলেই জমিদারী হস্তান্তর করে কলকাতায় ফিরবে। আমার বাবার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। ভারতবর্ষ কতদিন এক থাকতে পারে সেটাই মুখ্য বিষয়।

সুস্মিতার জীবনবোধ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দেখে আমি রীতিমত বিস্মিত। জীবনের জটিল সমীকরণের কথা না ভেবে বর্তমানকে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে হল। বললাম, সুস্মিতা কাল কোথায় বেড়াতে নিয়ে যাবে। সে বলল, ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে। ঠিক ৯টায় আমরা বেরিয়ে যাবো। কাকা বাবু গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। সাথে কাকা বাবুর সব থেকে পুরাতন ড্রাইভার আমাদের সাথে থাকবে। দাদা এবার তুমি ঘুমাও আমি আসি। কলকাতায় যতই রাত বাড়ছে গাড়ির গতি যেন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। ছুটে চলছে এক গন্তব্য থেকে আর এক গন্তব্যে, নীরব হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এক সময় চোখ বন্ধ হয়ে এলো।

সকাল নয়টায় কাকাবাবু আমাদের জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। আমি আর সুস্মিতা নাস্তা করে গাড়িতে উঠলাম। কলকাতা শহর ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাস, ট্রাম, লরি, সীমাহীন গতি নিয়ে গন্তব্যের দিকে ছুটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে প্রাইভেট কার আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রাইভেট কারের সংখ্যা খুব বেশি নাই বলেই মনে হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা চৌরঙ্গী এলাকায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের সামনে চলে এলাম। টিকিট কেটে আমরা মিউজিয়ামে প্রবেশ করলাম। জাদুঘরের গ্যালারি নানারকম জীবজন্তুর কঙ্কাল, ভাস্কর্য, মুদ্রা, কপার প্লেট, পেইন্টিং, পাণ্ডুলিপি, পোশাক পরিচ্ছদ দিয়ে সাজানো। সুস্মিতা বলল, দেখ ইন্ডিয়ার ইতিহাস কত প্রাচীন। সমৃদ্ধ ইতিহাস প্রদর্শনের জন্য ড্যানিশ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নাথানিয়াল ওয়ালিচ ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে এই জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠা করেন। কোন ইন্ডিয়ান জাদুঘর প্রতিষ্ঠার কথা কখনও ভাবেন নাই।

সুস্মিতা বললো, আমাদের পূর্ববঙ্গেরও গর্ব করার ইতিহাস আছে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় লেখমালার গ্যালারিতে যেয়ে আমি থেমে গেলাম। দেখলাম বগুড়ার মহাস্থানগড় থেকে পাওয়া একটা শিলালিপি। সম্রাট অশোক প্রাদেশিক শাসনকর্তা মহামাত্রেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী প্রজাদের সাহায্য দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দিতে। এর অর্থ পূর্ববঙ্গ অনেক আগে থেকেই সভ্য জাতি।

সুস্মিতা আরো বললো, শুধু মহাস্থান না। কুমিল্লার ময়নামতির লাইমাই পাহাড়বেষ্টিত বিরাট এলাকা একসময় শাসন করতো চন্দ্র, বর্ম এবং খড়গ রাজবংশ। ভারতীয় ইতিহাসবিদদের অনাগ্রহে সে ইতিহাস কেউ জানতেই পারে নাই। বাংলার প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালি শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে রচনা করছেন Early Indipendent Sultan of Bengal. যার মাধ্যমে বাংলার সমৃদ্ধির ইতিহাস আলোর মুখ দেখেছে।

তবে, কলকাতার সমৃদ্ধির আজকের অবস্থা পুরোটাই বৃটিশদের হাত ধরে। কলকাতাকে ঘিরেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছে। স্থানীয় লোকজন ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে ইউরোপীয় উদার গণতন্ত্র মূল্যবোধ সামাজিক শিষ্টাচারে নিজেদের তৈরি করতে পেরেছে। ব্রিটিশ প্রশাসন, ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছুতেই ভারতীয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুস্মিতা আরো বলল, একসময় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে শুধু বৃটিশদের নিয়োগ দেয়া হতো। সে সময় সিভিল সার্ভিসে ইন্ডিয়ানদের প্রবেশ সীমিত করতে বয়স কমিয়ে ২১ থেকে করা হয় ১৯ বছর। চট্টগ্রামের সুরেন্দ্র নাথ কলকাতা, পাঞ্জাব, মুর্শিদাবাদ, দিল্লী ভ্রমণ করে এদেশের শিক্ষিত যুবকদের সংগঠিত করে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে, সরকার সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ পুনরায় ২১ বছর নির্ধারণ করতে বাধ্য হয়। কোন ভারতীয়দের অন্য রাজ্যের কারো এ বিষয়ে কোন অবদান নাই।

সুস্মিতা সামাজিক সংগ্রামে এত কিছু জানে ভাবা যায় না। ওর কথা শুনতে শুনতে কখন যে দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। আমরা মিউজিয়াম থেকে বের হয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি চৌরঙ্গি থেকে সোজা আমাদের পার্কস্ট্রিটে নিয়ে এলো।

বাড়ি ফিরেই আমি সোজা দোতলায় আমার ঘরে চলে এলাম। ফ্রেস হয়ে ভাবতে লাগলাম, সুস্মিতার বয়স সবে চৌদ্দ কিংবা পনেরো। এই অল্প বয়সেই মেয়েটি ভারতের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আন্দোলন, সংগ্রাম সব বিষয়েই অনেক বেশি ধারণা রাখে। মেয়েটির জ্ঞানের গভীরতা আমাকে মুগ্ধ করছে। পাশাপাশি এটাও ভাবছি সুস্মিতা একটি উচ্চবিত্ত জমিদার পরিবারের কন্যা। জমিদারী পরিচালনার জন্য তাদের কাছে সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন আসে। এজন্য রাজনৈতিক, সামাজিক অনেক অবস্থা সম্পর্কে তাদের জানতে হয়। এছাড়াও প্রসিদ্ধ গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে অনেক ছোটবেলা থেকেই

তাদের শিক্ষা গ্রহণ শুরু হয়। তবে ধারণা করি সুস্মিতার আগ্রহ তাকে এতো কিছু জানতে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা পরেরদিন বেরিয়েছি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখতে। ভবনটি ব্রিটিশদের ভারতবর্ষে আগমনের নানা স্মৃতি সামগ্রী দিয়ে সাজানো। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখতে দেখতে সুস্মিতা বলল, 'ভাস্কো ডা গামা ছিলেন একজন জলদস্যু তিনি জলপথে বণিকদের জাহাজ লুট করতো। লুট করতে করতে তিনি একসময় ভারতবর্ষে প্রবেশ করে বিশাল এক জনপদ আবিষ্কার করেন। এরপর ব্রিটিশ, ফরাসি, মারাঠি, পর্তুগিজ বাণিজ্য জাহাজ ভারতবর্ষে আসতে শুরু করে। ইংরেজ বণিকদের প্রথমে হুগলি বন্দরে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন সুবাদার শায়েস্তা খান। শাহজাদা সুজা মাত্র ৩০০০ টাকা নজরানার বিনিময়ে ভারতে বিনা শুল্কে বাণিজ্য সুবিধা দেন। পরবর্তীকালে আওরঙ্গজেবের পণ্যদ্রব্যের ওপর ৩.২৫ ভাগ শুল্ক ধার্য করেন। এর সময় থেকেই ইংরেজ বণিকগণ শুল্ক ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেন। শায়েস্তা খানের কর্মচারীদের শুল্ক আদায়ের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ এনে ইংরেজ বণিক নজরানার বিনিময়ে তাদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য সুবিধা চান। কুঠি রক্ষার কথা বলে বিলাত থেকে উইলিয়াম হেজ ব্যাপক সৈন্য আমদানী করেন।

কিন্তু মোঘল শাসনের দৃঢ়তার কাছে বারবার পরাজিত হয়। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা নবাব হওয়ার পর পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ বণিক লর্ড ক্লাইভের কাছে পরাজিত হলে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা ইংরেজদের হাতে চলে যায়। পর্যায়ক্রমে পুরো ভারতবর্ষ ইংরেজদের শাসনে চলে যায়।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানায়। তারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে সরকারি চাকরিসহ আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে। লর্ড কর্নওয়ালিস ভূমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারী প্রথা প্রবর্তন করে। এজন্য এক শ্রেণির উচ্চবিত্ত হিন্দু জমিদার শ্রেণি সৃষ্টি হয়। মুসলিম সম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ পোষণ করে সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। তারা মনে করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলে তারা নাছারার জাতিতে পরিণত হবে। এছাড়াও মুঘল শাসন অর্থাৎ মুসলমান শাসনকে পরাজিত করে তারা এদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করে বলে ব্রিটিশদের মুসলমানরা বহিরাগত হিসেবে বিবেচনা করে। এজন্য মুসলমানরা আজ এতো পিছিয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার মত মেধাবী শিক্ষিত যুবকেরা একসময় এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে। একসময় এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি সুস্মিতার জীবনবোধ ভবিষ্যত পর্যবেক্ষণে বারবার অবাক হই আর ওকে দেখি। মেয়েটি শুধু অপূর্ব সুন্দরী নয়, মেধাবী, আত্মপ্রত্যয়ী, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রগাঢ় জ্ঞান মেয়েটিকে আরো আকর্ষণীয় করেছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় একটি মেয়ে কেবল দেখতে সুশ্রী হলেই তার জন্য ভালো বর এবং আর্থিক সমৃদ্ধশালী ঘর পাওয়া খুবই সহজ ব্যাপার। পাশাপাশি মেধাবী হলেতো কোন কথাই নাই। সুস্মিতার কথা ভাবতে ভাবতে একসময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

থেকে বের হয়ে এলাম। সেখান থেকে বের হয়ে সুস্মিতা আমাকে নিউমার্কেটের একটি টেইলারিং হাউজে নিয়ে এলো। আমি সুস্মিতাকে বললাম, 'কি ব্যাপার এখানে?' সুস্মিতা বলল, কাকিমা বলেছে, তোমার জন্য বেশ কিছু প্যান্ট শার্ট আর কমপ্লিট তৈরি করতে। কাল থেকে তুমি কলেজে যাবে। বৃন্দাবন সেনের বাড়িতে যিনি থাকেন তাকে তো সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পোশাক পরতে হবে। তা না হলে তো সম্মান রক্ষা হবে না। এছাড়াও ইংরেজি শাসন এখানকার সমাজ ব্যবস্থায় এনেছে ব্যাপক পরিবর্তন। যে কোনো ভাবেই হোক ইউরোপীয়ানদের মত নিজেকে অভ্যস্ত করতে হবে। আর ইংরেজি বলতে হবে অনর্গল। ভাবতে অবাক লাগছে। পূর্ব বাংলার অতি শিক্ষিত রমণী যখন কেবল একটি ভাল ঘর ও ভালো বর পাওয়ার প্রত্যাশা করে ঠিক সেই সময় পূর্ব বাংলার নির্ঘাত পাড়া গাঁয়ের সম্পদশালী জমিদারের একমাত্র কন্যা জীবনের প্রতিটি পরত কতভাবে পর্যালোচনা করতে শিখেছে। সুস্মিতা যখন কথা বলে তখন আত্মপ্রত্যয় যেমন প্রকাশ পায় তেমন তার আত্মমর্যাদার কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় না। সুস্মিতা আমার জন্য তিনটা প্যান্ট এবং তিনটা হাওয়াই শার্ট আর একসেট কমপ্লিট তৈরির অর্ডার দিলো। দোকানদার মাপ রাখার পর আমরা গাড়িতে করে পার্কস্ট্রিটের বাড়িতে চলে এলাম। বাড়ি ফেরার পর সুস্মিতা বলল, দাদা কাল সুখলাল তোমাকে কলেজে নিয়ে যাবে। তুমি তৈরি থেকো। আমি সুস্মিতাকে বললাম, 'সুখলালের অনেক কথা আমি বুঝতে পারি না। তোমার আর কোন কাজ না থাকলে আমি তোমার সাথেই যেতে পারি।' সুস্মিতা ঠোঁটের কোণে একটু মিষ্টি হেসে বলল, আচ্ছা। এরপর ওর ঘরে চলে গেলো।

আমি আমার ঘরে ঢুকে জানালা খুলে কলকাতার আকাশকে দেখার চেষ্টা করলাম। সুজনপুর আর কলকাতার আকাশ একটাই। সুজনপুরের আকাশে রাশিরাশি তারার মেলা কলকাতার আকাশে স্পর্শ করেছে বড় বড় ভবন, বিদ্যুতের আলোর ঝলকানিতে তারাগুলোকে ঠিকমত দেখা যায় না। নেই পাখির কূজন, ঝিঁঝি পোকা। কারো সাথে কারোর কুশল বিনিময়ের কোন সাধারণ দৃশ্য এখানে চোখে পড়ে না। শুধু ছুটে চলা আর ইংরেজ শাসনের একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে তৈরি করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আমার বাবজানও এদের ব্যতিক্রম নন। তিনিও চান আমি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে তৈরি করি। আর ভাবতে ভালো লাগছে না। বিছানায় যেয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙার পর সুখলাল এসে আমাকে বললেন, ছোটবাবু দিদি আপাকে কলেজ জানেকে লিয়ে বৈঠকখানায় বসে আছেন। বৈঠকখানায় এসে দেখি সুস্মিতা আজ সাদা শাড়ি পরেছে। লাল পাড়। সাদা ব্লাউজ। পায়ের স্যান্ডেলও সাদা। শাড়ি পরার পর সুস্মিতাকে আজ অনেক বড় মনে হচ্ছে। কপালে লালটিপ, চোখে কাজল। সুস্মিতার চোখ দুটিতে সবসময় অনেক অভিব্যক্তি লুকিয়ে থাকে। লুকিয়ে থাকে অনেক না বলা কথা। চোখের দিকে তাকালেই যেন হাজার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। ওর ভেতর যেমন আছে সারল্য তেমনি চোখে মুখে দীপ্তিময় আভা

ওকে সব সময় অন্য দশজনের থেকে আলাদা করে রাখে। ওর দিকে তাকালেই মনে হয় ওকে কেউ বিভ্রান্ত করতে কোনোদিন সাহস পাবে না।

আমি আর সুস্মিতা টানা গাড়ি নিয়ে সেন্ট জেভিয়ার্ড কলেজের দিকে রওনা হলাম। সকাল হতেই কলকাতার রাস্তা ছুটে চলা মানুষের ভিড়ে লোকারণ্য। বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, টানা গাড়ি যে যেমনটা পারে সেটা নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে। সুস্মিতা আমাকে কলেজের দোতলায় প্রিন্সিপাল গোবিন্দ কুমার মজুমদারের কক্ষের সামনে নিয়ে গেলো। প্রিন্সিপাল স্যারের কক্ষের সামনে মাঝ বয়সী এক পিয়ন কাঠের টুল নিয়ে বসা। আমাদের দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি বড় বাবুর সাথে দেখা করতে চান? সুস্মিতা হ্যাঁ বলতেই পিয়ন বললেন, আপনার পরিচয়। সুস্মিতা বলল, বাবু বৃন্দাবন সেন চৌধুরী আমাকে পাঠিয়েছেন। পিয়ন ভিতরে যেয়ে একটু পরেই বেরিয়ে এসে বলল, স্যার আপনাদের ডাকছেন।

সুস্মিতা প্রিন্সিপাল স্যারের সামনে যেতেই স্যার বললেন, সুস্মিতা তুমি ক্যামন আছো? অনেকদিন তোমার সাথে কথা হয় না। বৃন্দাবন ক্যামন আছে?

সুস্মিতা বলল, স্যার অনেক প্রশ্ন। আমি কি একটা একটা করে উত্তর দিতে পারি? সুস্মিতার কথা শুনে প্রিন্সিপাল স্যার হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, তোমাকে অনেক দিন পর দেখেই এতো প্রশ্ন। এখন বল কি জন্য এসেছো? সুস্মিতা বলল, স্যার উনি আবু বকর। পূর্ব বাংলা থেকে এসেছেন। মেধাবী ছাত্র। কাকা বাবু চান উনি আপনার এখানে ভর্তি হোক।

প্রিন্সিপাল স্যার বললেন, কোন অসুবিধা নাই। ওর জন্য আমি একটা সিট খালি রেখেছি। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মুসলিম ছেলেরা পড়তে চায় না। তাদের মধ্যে তুমি ব্যতিক্রম। গ্রামের স্কুলে পড়েও তুমি দারুণ রেজাল্ট করেছো শুনেছি। আশা করি আমার এখানে তুমি আরো ভালো করবে। এরপর তিনি একটা ভর্তি ফরম টেবিলের ড্রয়ার থেকে বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, পূরণ করে এডমিন স্যারের কাছে জমা দাও। তোমার ক্লাস শুরু আগামীকাল থেকে। ভর্তির ফরমালিটিস শেষ করে আমি আনমনে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। আমার পেছনে সুস্মিতা। হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদা স্টেশনে যেয়ে একটা লোহার বেঞ্চে বসে পড়লাম। সুস্মিতা আমার পাশে। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর সুস্মিতা জিজ্ঞেস করলো, দাদা কলকাতা তোমার ক্যামন লাগছে? আমি বললাম, জানি না। তবে, তুমি আছো এজন্য আমাকে একাকিত্ব স্পর্শ করতে পারে না।

আমার কথা শুনে সুস্মিতা আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর বলল, চল এবার চলে যাই। আমি সুস্মিতাকে বললাম, আমি যে শহরে বড় হয়েছি সেখানে রেল স্টেশন নাই। আমি কখনও ট্রেনে ভ্রমণ করি নাই। কলকাতা যেমন ব্যস্ত তেমনি শিয়ালদা স্টেশন। সারাক্ষণ একটার পর একটা ট্রেন আসতে থাকে। ট্রেনের যাত্রী, কুলি, ফেরিওয়ালাদের ডাকাডাকি লেগেই থাকে। পূর্ব বঙ্গের পাহাড়তলী থেকে শিয়ালদা হয়ে দিল্লি বোম্বাই মাদ্রাজ, কত না শহর দিনরাত

অতিক্রম করে এই ট্রেন। তবে ব্রিটিশ শাসনে যুক্ত হওয়ার পর কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে ট্রাম। নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্তের জনপ্রিয় বাহন ট্রাম।

সুস্মিতা বলল, তুমি নিশ্চয়ই ট্রামে ভ্রমণ করো নাই। আমি বললাম, কীভাবে বুঝলে? সুস্মিতা বলল, আমি বুঝতে পারি। তবে, তোমার এ আক্ষেপও ঘুচে যাবে। পার্ক স্ট্রিট থেকে তুমি প্রতিদিন কলেজ স্ট্রিটের তোমার কলেজে ট্রামে যাতায়াত করতে পারবে। আজকাল অবশ্য ট্রামে পকেটমারদেরও জার্নি করতে দেখা যায়। এজন্য সবসময় সাবধানে থাকবে। আমি সুস্মিতাকে আগাম সতর্ক করে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানালাম। এর মধ্যে আট দশ বছরের একটা ছেলে চা গরম বলতে বলতে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো। সুস্মিতাকে বললাম, চা খাবে? সুস্মিতা না করলো না। আমি দু'কাপ চা নিয়ে একটা সুস্মিতাকে দিলাম অপরটা নিজে নিলাম।

চা খাওয়ার পর সুস্মিতা বলল, আরো কিছুক্ষণ বসবে নাকি যাবে। আমি সুস্মিতার চোখে মুখে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকার আগ্রহ অনুভব করে বললাম, আমাদের কি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার। সুস্মিতা বলল, না সে রকম কিছু না তবে, এক জীবনে এতো ছুটে চলা দেখতে ভালো লাগে না। মানুষ কখনও কখনও নিজেকে নিয়ে ভাববে। জীবনের অর্থ খুঁজবে, জীবনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন করবে, তা না হলে মানুষ হয়ে জন্মানোর সার্থকতা কোথায়? দিনের শেষে কি পেলাম এটা বড় বিষয় নয়; কি দিতে পারলাম, সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতির জন্য আমার অবদান কি এটাই মুখ্য বিষয়। সুস্মিতাকে বললাম, তুমি এ দেশের একটি উচ্চবিত্ত পরিবারের সদস্য। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নেতৃত্ব দেবার মত একটা পরিবারের সদস্য। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকভাবে তোমার রয়েছে বলিষ্ঠ অবস্থান। তোমার পক্ষে মানব কল্যাণ ভাবনা খুবই সঙ্গত। কিন্তু একটা কথা ভাবো প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষক কলিমুদ্দিন। যিনি ফসল ফলানোর জন্য দিনরাত রোদ্রে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে, হঠাৎ বন্যায় কিংবা খরায় একটি মাত্র ফসল যখন নষ্ট হয় তখন কি করে মানব কল্যাণের কথা ভাববে? যখন তার সন্তানের পেটে ভাত তরকারির জোগান দিতে পারে না। তখন সে কি করে মানবজাতির চাঁদে যাওয়ার কথা ভাববে? সুস্মিতা বলল, কর্নওয়ালিস যে জমিদারী ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে, সে ব্যবস্থায় দরিদ্র প্রান্তিক কৃষকের জীবন মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। জমির মালিকানা কৃষকদের হাতে তুলে দিতে পারলে এই সমস্যার সমাধান করা যায়।

আমি বললাম, ব্রিটিশরা এদেশে এসেছে বাণিজ্য প্রসারের জন্য। কৃষক জমিদারদের খাজনা না দিতে পেরে নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে কি না এ নিয়ে তাদের কোন ভাবনা নাই। বছরের শেষে খাজনার একটা অংশ ইংরেজ বণিকদের কোষাগারে জমা হলেই তারা খুশি। ভূমি জরিপ করার জন্য ইংরেজ কোম্পানি যে নকশা তৈরি করেছে সেটার মূল উদ্দেশ্য ভূমির সঠিক পরিমাপ যথাযথভাবে নির্ণয় করে সঠিক রাজস্ব আদায় করা।

তবে সব জমিদার শুধু খাজনা আদায়ের মহা উৎসবে ব্যস্ত এমন নয়। দেশে কালিকুমার সেন চৌধুরীর মত জমিদারও রয়েছে। প্রজা মঙ্গল যাদের ভাবনায় স্থায়ী আসন তৈরি করে আছে। নিজের বাবার প্রশংসা শুনে সুস্মিতার ঠোঁটের কোণে এক টুকরা হাসি স্পর্শ করে গেলো।

সে বলল, শুধু প্রজার মঙ্গল কামনাই বাবা করেন না। তিনি যোগ্য এবং সৎ লোককেও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। যেমন ধর তোমার বাবজান। আর্থিক দুরাবস্থার মাঝেও তিনি নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া করেছেন। আর্থিক দীনতার দোহাই নিয়ে কখনও অসৎ জীবন যাপন করেন নাই। এজন্য বাবা তাকে কত পছন্দ করেন।

আমি সুস্মিতাকে বললাম, এজন্য বাবজান তোমার বাবাকে কত সম্মান করেন। সুস্মিতা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে আমার কথা শুনছিল। এবার যেন তার মনে হলো বাড়ি ফেরার কথা। আমাকে বলল, চলো অনেক সময় পার হয়ে গেছে। কাকিমা আমাকে কিছুক্ষণ না দেখলেই অস্থির হয়ে পড়েন। মনে করেন আমিও হয়তো একদিন হারিয়ে যাবো দূর কোন অজানায়। সুস্মিতার কথা শুনে আমি উঠে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে এসে একটা টানাগাড়িকে ডেকে বললাম, পার্ক স্ট্রিট জায়েগা। সে রাজি হলো। আমরা দুজন গাড়িতে উঠে বসলাম। হাওড়া ব্রিজ, দক্ষিণেশ্বর কালিমন্দির, ফোর্ট উইলিয়াম, আলিপুর, সাউথ পার্ক দেখতে দেখতে এক সময় পার্কস্ট্রিটে এসে নামলাম।

বাড়ির সামনে এসে দেখলাম কাকিমা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের দেখে উনার কপালের চিন্তার ভাঁজ দূর হয়ে গেলো। আমাকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করলো তোমার ভর্তির কাজ শেষ হয়েছে তো? আমি বললাম, জি।

এরপর কাকিমা বললেন, এবার যাও বিশ্রাম কর। আমি কাকিমার কথা মত নিজের ঘরে গেলাম। আজ ঘরে আলো জ্বালাতে ইচ্ছে করছে না। সুজনপুরের সীমাহীন অন্ধকারকে আমার অনুভূতিতে আজ কাছে টানতে ইচ্ছে করছে। আরো ইচ্ছে করছে জোনাকি পোকা, ঝিঁঝি পোকা, লক্ষ্মী পেঁচা, শালিক, টিয়া পাখি, চিল, শকুন, দোয়েল, শ্যামার ডাক আর কিছু না হোক কাকের কা-কা শব্দ তো শোনা যাবে। বাবুই পাখি কিংবা চড়ুই পাখির দল বেঁধে ছুটে চলার দৃশ্য আমি যেন যোজন যোজন দূরে ফেলে এসেছি।

এখানে ইট পাথরের কঠিন দেয়াল, ইলেকট্রিক বাতির ঝাঁঝালো আলো, ট্রেন, ট্রাম, প্রাইভেট কারের একটানা ছুটে চলা কিংবা টানা গাড়ির চালকের হেই শব্দে ছুটে চলা ছাড়া আর কোন দৃশ্য চোখে পড়ে না। চাঁদের মিষ্টি ঝলমলে আলো কলকাতা শহরকে আলোকিত করার কোন সুযোগ পায় না। কৃত্রিম ইলেকট্রিক বাতির আলো প্রকৃতির সব আলোকে যেন কেড়ে নিয়েছে।

আমি আজ আলো জ্বালবো না। আলোহীন কলকাতার একটা ঘর ক্যামন লাগে বুঝতে চাই। এমন সময় দরজার সামনে এসে সুস্মিতা জিজ্ঞেস করলো দাদা আলো জ্বালাওনি কেন? আমি বললাম, ইচ্ছে করছে না। এরপর বললো, খেতে এসো।

আমি বললাম, ইচ্ছে করছে না। সুস্মিতা বলল, কাকিমা খাবার নিয়ে বসে আছেন। আমি আর কোন কথা বললাম না সুস্মিতাকে অনুসরণ করে খাবার ঘরে গেলাম।

কাকিমা বললেন, আবু বকর তোমার কি শরীর খারাপ? বললাম, সে রকম কিছু না। কাকিমা বললেন, ঠিক আছে খেয়ে শুয়ে পড়। আমি খেয়ে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। দোতলার আমি যে ঘরটিতে থাকি তার উল্টা দিকের কোণার ঘরটি সুস্মিতার। কেন জানি সুস্মিতা আজ তার ঘরের আলো বন্ধ করে নাই। আরাম কেদারায় বসে সারারাত পার করবে বলে মনে হচ্ছে। সুস্মিতার এই অনিদ্রাযাপন কি মাঝে মাঝেই করে? কলকাতার পরিবেশে আলো বাতাসে সে তো বেশ অভ্যস্ত। তাহলে কেন এই নির্ঘুম রাত্রি যাপন আমি ভেবে পাই না। ভোর রাতে আমি আর জেগে থাকতে পারলাম না। ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমানোর সময় দেখলাম সুস্মিতা তখনও আরাম কেদারায় বসে কি যেন চিন্তা করছে।

সকালে আমি কলেজে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। সুস্মিতা আমার ঘরে ঢুকে আমার পকেটে একটা কলম গুঁজে দিয়ে বলল, দাদা এটা পার্কার কলম। ধনাঢ্য পরিবারের ছেলে-মেয়েরা এই ধরনের কলম ব্যবহার করে। কলকাতার ছেলে-মেয়েরা ভাবে পূর্ববঙ্গের ছেলে-মেয়েরা তিন বেলা খেতেই পারে না, লেখাপড়া করবে কেমন করে। যদিও তোমার মেধার পরিচয় ওরা ক'দিন পরেই পাবে। তবুও শুরু থেকেই তোমাকে বিত্তবানদের ঠাটবাট নিতে চলতে হবে। তুমি কারোর থেকে কোন বিষয়ে কম না এটা বোঝাতে হবে। পূর্ববঙ্গের অজপাড়াগাঁয়ের প্রান্তিক কৃষক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের একটা ছেলে, যে কোন দিন কোন বড় শহর দেখে নাই, যে কলকাতার মত বড় শহরের ইউরোপীয়ান সংস্কৃতির সাথে পরিচিত ছেলে-মেয়েদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। তবুও এই স্বাভাবিক অভিযোজন প্রক্রিয়ার যাঁতাকলে আমি যেন পিষ্ট না হই সেই বিষয়ে সুস্মিতার ভাবনা যা আমার খুব ভালো লাগলো। পূর্ববঙ্গের জমিদার কালিকুমার সেন চৌধুরীর প্রজা কলকাতায় ইউরোপিয় সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না এটা হতে পারে না, এই ভবনটিও কাজ করতে পারে। এও হতে পারে আমার প্রতি সুস্মিতার আলাদা কোন অনুকম্পা, দয়া, সহানুভূতি অনেক কিছুই থাকতে পারে।

তবুও আজ সকালের শুরুটা আমার কাছে অনেক দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ একটি সকাল হিসেবে আমার হৃদয়ে জায়গা পেলো।

পার্কস্ট্রিট থেকে বড় রাস্তায় যেয়ে ট্রামে চাপলাম। কলকাতার মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সকলের প্রিয় বাহন এই ট্রাম। ট্রামের জানালার পাশে বসার জন্য কিছু সিট থাকলেও অধিকাংশ যাত্রী দাঁড়িয়ে ভ্রমণ করে। ট্রামে ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি খুব সাধারণ ব্যাপার। এ নিয়ে কেউ অভিযোগ করে না।

কলেজ স্ট্রিটে নেমে সোজা কলেজের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। মূল গেট পার হতেই দেখলাম ছেলে-মেয়েরা জটলা করে হৈ চৈ করছে। আমাকে প্রবেশ করতে দেখে একজন বলল, কি রে নতুন? আর একজন বলল, মৃণাল পার্টির ছেলে ওর কথার বাইরে যাবি না। আমি আচ্ছা বলে জিজ্ঞেস করলাম, এফ.এ. ক্লাসটা কোথায়? একজন বলল, দোতলায় ডান পাশে । সোজা চলে যা। আমি হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় চলে গেলাম। দোতলায় যেয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম এফ.এ. ক্লাসটা কোথায়? সে বলল, নিচতলায় উত্তর পাশে। এ ধরনের প্রহসনের কোন মানে আমি খুঁজে পেলাম না। নিচতলায় এসে ক্লাসে ঢুকলাম। ক্লাসে ঢুকতেই আমাকে সমস্বরে সবাই স্বাগতম বলে অভ্যর্থনা জানালো।

ক্লাসে প্রায় চল্লিশজন ছেলে আর পাঁচজন মেয়ে বসা। আমি মাঝখানের একটা বেঞ্চে বসলাম। আমার পাশে ছিপছিপে গড়নের একটা ছেলে। গায়ের রঙ শ্যামলা। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমার নাম সুবল কান্তি সাহা।' এরমধ্যে গণিতের শিক্ষক ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী ক্লাসে এলেন। বীজগণিতের কিছু সমাধান ছাত্রদের কাছে জানতে চাইলেই, জানে কি না জানি না। কেউ উত্তর দিলো না। আমি দাঁড়িয়ে একের পর এক উত্তর দিলাম। স্যার বললেন, তুমি কে হে ছোকরা? আমি বললাম, আমার নাম আবু বকর। নাম শুনে বললেন, মুসলিম ছেলেরা অংকে কাঁচা এ কথা আমি আর কোনোদিন বলবো না। তুমি আমার ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছ।

স্যার চলে যাওয়ার পর একে একে সকলে আমার সাথে পরিচিত হতে শুরু করলো। ভাস্কর, নীহার, মৃণাল, অরুণ, প্রাণতোষ, সুশীল, রতন, বিশ্বজিৎ, রণজিৎসহ অনেকে এসে আমার সাথে হাত মিলিয়ে পরিচিত হলো। মেয়েদের মধ্যে সবিতা বেশ চটপটে। নিজের নাম বলে, তোমার নাম কি? আমি আমার নাম বললাম। ক্লাস শেষে ট্রামে সোজা পার্কস্ট্রিট। বাড়ির সামনে এসে দেখলাম সুস্মিতা আর কাকিমা বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে। আমি ঢুকতেই কাকিমা জিজ্ঞেস করলেন, কলেজ ক্যামন। আমি বললাম, বেশ ভালো। সুস্মিতা বলল, মুখ হাত ধুয়ে নাও একসাথে খাবো। খাবার টেবিলে সুস্মিতা জিজ্ঞেস করলো, ছেলে-মেয়েরা তোমাকে নিয়ে তামাশা করে নাই? আমি বললাম, শুরুতে একটু হয়েছিল তারপর কোন সমস্যা হয় নাই। সুস্মিতা বলল, কলকাতার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এ ধরনের অহেতুক মজা করার প্রবণতা খুব বেশি। তোমাকে সাবধান থাকতে হবে।

সন্ধ্যার পর সুস্মিতা আর আমি পড়ার টেবিলে পাশাপাশি বসলাম। সুস্মিতা অংকের বই খাতা নিয়ে ঝটপট একের পর এক অংক সমাধান করলো। ওর অঙ্কের পারদর্শিতা দেখে আমি হতবাক। মেয়েটি নিজে থেকেই এত বেশি পারদর্শী ভাবা যায় না। আমি বললাম, সুস্মিতা এতো সব কঠিন অংক তুমি নিজে নিজে কীভাবে সমাধান করো? সুস্মিতা বলল, তোমার মত মেধাবী ছাত্র আমার পাশে এটাই আমার অনুপ্রেরণা। পড়তে পড়তে সুস্মিতা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী? আমি বললাম, আমি ডাক্তার হতে চাই। মানুষের সেবা করতে চাই। যদি সুযোগ পাই বিলাতে যেয়ে পড়ালেখা করবো।

এরপর সুস্মিতাকে বললাম, তুমি কি পড়তে চাও? সে বলল, এতোদিন এ নিয়ে কিছু ভাবি না। তোমার ভাবনা আমাকে প্রভাবিত করছে, আমিও ডাক্তারি পড়তে চাই। আমি বললাম, তোমার এ ভাবনাটি খুবই সঙ্গত। পূর্ব বাংলার সুজনপুর গ্রামের অসহায় প্রজারা জমিদার কন্যার কল্যাণে সুচিকিৎসা পাবে এটা বড় একটা ব্যাপার। শুধু ডাক্তার হলেই হবে না, তোমার মত মানব দরদী হৃদয়ের মানুষের ডাক্তারি পেশায় যাওয়া খুবই প্রয়োজন।

সুস্মিতা আমার কথা শুনে বলল, আমি মানব দরদী এটা ক্যামন করে বুঝলে? আমি বললাম, আমার মত অসহায়কে আশ্রয় আর বেড়ে ওঠার পেছনে তোমার সহায়তা। সুস্মিতা বলল, তুমি নিজেকে এতো অসহায় কেন মনে কর? তোমার ভেতরে যে ঔজ্জ্বল্য রয়েছে সেটার মূল্য অনেক বেশি। এই বলে সুস্মিতা চলে গেলো। আমি একা একা অনেকক্ষণ চেয়ারে বসে রইলাম, মনে মনে ভাবলাম সত্যিই কি আমি একদিন একটা কিছু হতে পারবো?

প্রতিদিন সকালে উঠে ট্রামে কলেজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। বিকেলে বাড়ি গিয়ে সুস্মিতাকে নিয়ে পড়তে বসা রোজকার নিয়মে দাঁড়িয়েছে। আজকাল সুস্মিতা রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়েও কথা বলে। পোস্টমাস্টার রতনকে কেন আবিষ্কার করতে পারলো না। কেন বুঝল না রতনের হৃদয়ের সুপ্ত বাসনাকে? রবীন্দ্র সাহিত্য আমি খুব একটা চর্চা করি নাই। সুস্মিতার প্রেম বিরহের এতসব প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারি না। সুস্মিতা মাঝে মাঝে বলে তুমি সুযোগ পেলে রবীন্দ্র সাহিত্য পড়বে। ভারতীয় বলে নয়, রবীন্দ্রনাথ সত্যি বিশ্বসাহিত্যের অহংকার।

ইদানীং আমি কলেজ স্টিটের লাইব্রেরিতে সুযোগ পেলেই রবীন্দ্র, বঙ্কিম, শরৎ চন্দ্রের বই পড়ি। সুস্মিতার অনেক প্রশ্নের উত্তর আমি অনেক সময় দিতে পারি না। এজন্য আমাকে পড়তে হবে। আজ সন্ধ্যায় পড়তে পড়তে হঠাৎ সুস্মিতাকে বললাম, রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা পড়েছো? সুস্মিতা উত্তর দিলো, হ্যাঁ। এরপর বলল বলোতো, অমিত কেন লাবণ্যর মত সাহসী হতে পারলো না? আমি বললাম, অমিত মনে করে লাবণ্যর হৃদয় গভীর এক সমুদ্র, সে হৃদয় অনুভব করা যায় কিন্তু স্পর্শ করা যায় না। এজন্য দূর আকাশের তারার মতো তার পরশ পাওয়ার চেষ্টা না করে তাকে কেবল অনুভবে ধারণ করাই যৌক্তিক বলে মনে করে।

আমার উত্তর শুনে সুস্মিতা বলল, তুমি রবীন্দ্র সাহিত্য কবে থেকে চর্চা করছো? আমি বললাম, কলেজ স্ট্রিটে বসে আজকাল একটা দুটা পড়ছি। সুস্মিতা বলল, আমাদের বৈঠকখানার শেলফে অনেক বই, শেক্সপিয়ার, বাইরন, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, রবীন্দ্র, নজরুল, বঙ্কিম, শরৎ সবার বই পাবে। ইচ্ছে করলে পড়তে পারো। এরপর সুস্মিতা বলল, সাহিত্য চর্চা যেন তোমার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখবে।

আমি বললাম, সে রকম কিছু না, তুমি এতোসব বই পড়, আমি তোমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। এজন্য আজকাল এ নিয়ে একটু চর্চা করি।

আমার কথা শুনে সুস্মিতা একটু বিব্রত বোধ করলো, তারপর বলল, না বিজ্ঞানের ছাত্ররা সাহিত্য চর্চা খুব একটা করতে পারে না। এটা দোষের কিছু না। তবে জানা থাকা ভালো। এ নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে কথা বলতে পারবো।

সুস্মিতা আজকাল বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে বেশ পড়ালেখা করে। এমনিতেই সে খুব মেধাবী। তার ওপর ওর জানার আগ্রহ প্রবল। সব বিষয়েই গভীর নিরীক্ষাধর্মী জ্ঞান অর্জনে সুস্মিতার পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করার মত।

দেখতে দেখতে সুস্মিতার ম্যাট্রিকুলেট পরীক্ষা শুরু হল। ওর পরীক্ষার সিট পড়েছে কুইন মেরী কলেজে। আমি প্রতিদিন সকালে সুস্মিতাকে ওর পরীক্ষা সেন্টারে পৌঁছে দিয়ে কলেজে যাই। ক্লাস করে কুইন মেরী কলেজ থেকে ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরি। প্রতিদিন জিজ্ঞেস করি, তোমার পরীক্ষা কেমন হলো? জানি ও ভালো করবে তবুও জিজ্ঞাসা। সুস্মিতা অতি সাধারণ উত্তর ভালো বলেই অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়।

আমাকেও জিজ্ঞেস করে তোমার পরীক্ষা তো কয়েকদিন পরেই। কেমন প্রস্তুতি। আমি বললাম, ভালোই। সুস্মিতা আমাকে আরো মনোযোগী হতে পরামর্শ দিলো।

আজ ক্লাসে ঢুকে দেখলাম স্যার আসেন নাই। মৃণাল, দিলীপ, নীহার, আকবর, রইস উদ্দিন প্রাণতোষ এক জায়গায় গোল হয়ে বসে জমিয়ে আড্ডা মারছে। একটু পরপর হৈ হৈ করে উঠছে। আমি কাছে যেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোরা কি বিষয় নিয়ে কথা বলছিস। মৃণাল বলল, তোর বিষয় নিয়েই কথা বলছি। আমি বললাম,

আমার আবার কি বিষয়? দিলীপ বলল, মৃণাল বলল, তুই যে বাড়িতে থাকিস সে বাড়িতে একটি মেয়ে আছে, মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। মেরী কুইন স্কুলের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রী। সুনীলের ধারণা তুই মেয়েটিকে পছন্দ করিস।

আমি বললাম, নীল আকাশ, পূর্ণিমার চাঁদ, ফুল বাগান, বিস্তীর্ণ জলরাশি, বনভূমি কে অপছন্দ করে? সুস্মিতা দেখতে শুধু সুন্দরই না, মেধাবী। তার জীবনবোধ ভবিষ্যত পরিকল্পনা তার ব্যক্তিত্বকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ওর ব্যক্তিত্ব ওকে বহুগুণ আলাদা করেছে। একজন সাধারণ মেয়ে দশ বছর পর কি হতে পারে সেটা ভাবতে পারে না, সুস্মিতা একশত বছর কি হতে পারে সেটা বলতে পারে। উচ্চবিত্ত জমিদারের কন্যা হয়েও সে অতি সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সুস্মিতাকে অপছন্দ করার কোনো সুযোগ কারো নাই। মৃণাল বলল, তাহলে আমরা যেটা ভাবছি সেটাই কি সত্যি? আমি বললাম, সুস্মিতা জমিদারের কন্যা, আর আমি সেই জমিদারীতে কর্মরত অতি সাধারণ একজন কর্মচারীর ছেলে। যে নিজেকে আগামী দিনের জন্য তৈরির চেষ্টা করছে। সে তৈরির পেছনে রয়েছে জমিদার বাবু এবং তাঁর পরিবারের অকুণ্ঠ সমর্থন আর বিরামহীন সহায়তা। অসম দুই দিগন্তের মেলবন্ধন কি করে সম্ভব?

মৃণাল বলল, তাহলে আমরা এই সম্পর্কটার কি পরিণতি আশা করতে পারি? আমি বললাম, পরিণতি খুবই পরিষ্কার, সুস্মিতা একদিন বড় ডাক্তার হবে। তাঁর বিয়ে হবে কোনো এক জমিদারের উচ্চশিক্ষিত ছেলের সঙ্গে। আমি হয়তো একদিন ডাক্তার হয়ে পূর্ব বঙ্গের সুজনপুর গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ে বসে হেপুর রোগী কলিমুদ্দিন কিংবা যক্ষা রোগী মিনহাজুলকে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাবো। বিয়ে করব গ্রামের কোনো এক মধ্যবিত্ত পরিবারের পঞ্চম শ্রেণি পাস করা কন্যাকে। যে প্রতিদিন আমার জন্য সকাল থেকে রাত অবধি খাবার সাজিয়ে আমার ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকবে। সুস্মিতা কখনও তাদের বাড়িতে স্বামী সন্তান নিয়ে বেড়াতে এলে, আমি আমার স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে ওর সাথে দেখা করবো। সে আমাদের কুশলাদি জানবে, এর থেকে আর বেশি কিছু না। বলা যায় এরকমই হবে নিশ্চিত পরিণতি। দিলীপ বলল, যাই বলিস প্রকৃতিতে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে যেটা মানুষ চিন্তাও করতে পারে না। আমাদের ধারণা তোর পরিণতি সে রকমই হবে। মৃণাল বলল, আমরা ভবিষ্যত পরিণতিকে ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেই। এবার আলোচনা করি সামনের এফ.এ. ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে। এমন সময় উচ্চতর গণিতের স্যার মদন মোহন রায় ক্লাসে ঢুকেই আমাকে বোর্ডে বীজগণিতের একটা অঙ্কের সমাধান বের করার জন্য বললেন, আমি বোর্ডে যেয়ে দ্রুত অঙ্কের সমাধান করলাম। মদন মোহন স্যার বললেন, আবু বকর, মুসলিম ছেলেরা বিশেষ করে পূর্ব বঙ্গের ছেলেরা অংক দেখলে ভয় পায়। অথচ তুমি কঠিন কঠিন অংক সহজে সমাধান করে ফ্যালো কীভাবে? আমি বললাম, স্যার, পূর্ব বঙ্গের ছেলে-মেয়েরা প্রকৃত অর্থেই মেধাবী। পাহাড়পুর, ময়নামতিতে অষ্টম শতাব্দীতে শিক্ষা বিকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছিলো। চীনসহ সারা পৃথিবীর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পূর্ব বঙ্গে

এসে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতো। ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় খড়গ, চন্দ, বর্ম রাজবংশের সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইতিহাস এতদিন আমরা জানতে পারিনি কিন্তু এখন জানি। বলা যায় সমগ্র ইউরোপ যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলো, তখন পূর্ববঙ্গ শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে শিক্ষা প্রসারে এগিয়ে ছিলো পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। এবার স্যার প্রশ্ন করলেন, তাহলে এখন শিক্ষায় পূর্ব বঙ্গ এতো পিছিয়ে কেন?

আসলে স্যার ইংরেজ শাসকদের মুসলমানরা সবসময় বহিরাগত এবং অবৈধ দখলদার হিসেবে মনে করে। ইংরেজিকে মনে করে নাছারার ভাষা। ইংরেজির প্রতি বিদ্বেষ এবং ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহ মুসলিমদের পিছিয়ে দিয়েছে। এজন্য ইউরোপীয় ধ্যান আগ্রহ গণতন্ত্র সম্পর্কে মুসলমানদের কোনো ধারণা নাই। শিক্ষার পশ্চাৎপদতা মুসলমানদের সরকারি চাকরি ও সুযোগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে। এজন্য মুসলিম সম্প্রদায় এতোটা পিছিয়ে। মাঝে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা বিরোধিতা না করলে ঢাকা রাজধানী হতো পূর্ববঙ্গের মুসলিমরা নতুন শাসন ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে এগুতে পারতো। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পূর্ববাংলার শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখছে তবে সেটা পূর্ব বাংলার সব অংশ সমানভাবে এর সুযোগ পাচ্ছে না। পাশাপাশি কলকাতা, আলিগড়, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করছে শিক্ষিত যুব সমাজ যারা আর্থসামাজিক উন্নয়নে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আমার কথা শুনে মদন মোহন লাল স্যার অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলল, আবু বকর তোমার বিশ্লেষণ যথাযথ। তোমার মত পূর্ববঙ্গের মেধাবী শিক্ষার্থীরা একদিন বাংলাকে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। এই কথা বলে স্যার হনহন করে বেরিয়ে গেলেন।

আমার সহপাঠীরা বলল, আবু বকর তুই বিজ্ঞানের একজন তুখোড় ছাত্র। আমাদের ধারণা এ বছর তুই পরীক্ষায় সেরাদের মধ্যে থাকবি। তোর সমাজ বিশ্লেষণ যে এতো ভালো এটা আমরা জানতাম না। তুই সত্যি একদিন সম্ভাবনার সব সিঁড়ি উত্তরণ করবি এটা আমাদের বিশ্বাস। মৃণাল বলল, শুধু পড়ালেখায় না প্রেমের ক্ষেত্রেও তুই ভালো করবি এটা অন্তত আমার বিশ্বাস।

বাড়ি ফিরে দেখলাম সুস্মিতা সদর দরজায় দাঁড়িয়ে, পরনে বেনারশী শাড়ি। বেশ কারুকাজ করা। যতদূর জানি বিয়ের অনুষ্ঠানে কলকাতার মেয়েরা এই শাড়ি পরে।

আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, দাদা এতো দেরী কেন? আমি বললাম, কলকাতা নিউমার্কেটের পাশে দাঁড়িয়ে ট্রামের যাওয়া আসা দেখছিলাম। পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাস হাঁটতে হাঁটতে যেখানে ট্রামের ধাক্কায় পড়ে গিয়েছিলেন সেখানে আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। আর ভাবছিলাম এই কবি বেঁচে থাকলে বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছ থেকে আরো অনেক সাহিত্য উপাদান পেতে পারতো। সে যাই হোক তুমি এতো সুন্দর করে সেজেছো কেন? প্রশ্ন করতেই সুস্মিতা বলল–

আজ আমার জন্মদিন। কাকিমা নানা রকম খাবার রান্না করিয়েছেন। এক সাথে খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। আমি সুস্মিতাকে বললাম, কই গতকালতো কিছু বল নাই। সুস্মিতা বলল, কাকিমার তৃতীয় সন্তানের মৃত্যু হয়েছিলো এই তারিখে। এজন্য কাকিমার দিনটা কাটে খুব কষ্টে। আমিও কাকিমার সাথে চুপকরে বসে থাকি। আজ সকালেই কাকিমা বলল, 'কি রে তোর না আজ জন্মদিন। একটু ভালো করে সাজগোজ কর।' এজন্য এতসব।

আমি বললাম, তুমি শাড়ি পরলে অনেক বড় মনে হয়। আমার কলেজের ইংরেজি ম্যাডাম শ্রীমতি মঞ্জুরানী প্রামাণিক তোমার মত বেনারসী পরে। চোখে পরেন আধুনিক ফ্রেমের চশমা। বেশ একটা অভিজাত ভাব রয়েছে উনার চাহনীতে। আমার কথা শুনে সুস্মিতা বলল, তোমায় পর্যবেক্ষণ শক্তি ভালো। আমাকে দেখতে সত্যি মঞ্জুরানী ম্যাডামের মতই শুধু লাগছে না কি আরও কিছু।

আমি বললাম, অন্য যে কারো থেকে একদম আলাদা। এতো বিত্ত বৈভব তবুও এ নিয়ে তোমার নেই কোনো অহংকার। জীবনবোধ একেবারেই প্রখর। জ্ঞান বুদ্ধি যে কারো থেকে ভালো। পাশাপাশি তোমার সৌন্দর্য তোমাকে করেছে মহিমান্বিত।

আমার বিশ্লেষণে সুস্মিতা একটু লজ্জা পেয়ে বলল, ঠিক আছে এবার চলো। তোমার জন্য আমিও না খেয়ে বসে আছি। আমি সুস্মিতাকে অনুসরণ করে খাবার টেবিলে গেলাম। কাকিমা টেবিলে এসে বলল, সকালে চলে যাও সারাদিনতো খাওয়া হয় না। একটু টিফিন নিয়ে গেলেই তো পারো। আমি বললাম, কাকিমা কলেজ ক্যান্টিনে সিঙ্গারা পাওয়া যায়। ওখানেই খেয়ে নেই। খাওয়া-দাওয়া করে আমি আমার ঘরে চলে এলাম।

ঘরে ফিরে আমি ভাবছিলাম, আমি কি সত্যি সুস্মিতার প্রতি আসক্ত। যদি হয়ে থাকি এটা হবে আমার জন্য দুঃস্বপ্ন। আমি সুজনপুর গ্রামের এক অভাবী গরীব প্রান্তিক কৃষকের ছেলে। জমিদারের অনুগ্রহে কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতার মুখ দেখলেও চাঁদ স্পর্শ করার মত দুঃসাহস থাকা ঠিক হবে না। সুস্মিতাকে যদি ১০০ এর মধ্যে ১০০ নম্বর দেয়ায় যায় যেখানে আমি ৩৩ পেয়ে কোনো রকমে পাস করার মত অতি সাধারণ একজন ছাত্র। আমার পক্ষে অনেক বড় স্বপ্ন দেখাও অন্যায়। এমন অনেক বিষয় নিয়েই ভাবছি এমন সময় সুস্মিতা আমার ঘরে এলো। ওর হাতে মিষ্টির বাটি। আমাকে মিষ্টির বাটি দিয়ে বলল, এটা কলকাতার রসগোল্লা। তুমি তো মিষ্টি খেতে পছন্দ করো। তোমার ভালো লাগবে। আমি মিষ্টির বাটি থেকে দুটো মিষ্টি নিয়ে খেয়ে দেখলাম। তারপর সুস্মিতাকে বললাম, তোমার রেজাল্ট তো এ সপ্তাহে বের হওয়ার কথা। তোমার ভয় লাগছে না? সুস্মিতা বলল, তোমার সাথে থাকতে থাকতে আমিও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে পড়েছি। মনে হয় আমিও তোমার মতো ভালো একটা কিছু করবো। আমি বললাম, আমি ভালো তবে সুস্মিতার মত অত ভালো না। আমার কথা শুনে সুস্মিতা বলল, ফলভারে বৃক্ষ নুয়ে পড়ে তোমার দেখি সেই অবস্থা। এই বলে সুস্মিতা চলে গেলো। আমি ভালো

করেই জানি সুস্মিতা আমার জন্য স্বপ্নের মত একটা ব্যাপার। ঘুম ভেঙে গেলেই আমি চলে যাবো বাস্তবের মুখোমুখি। যেখানে থাকবে আধপেটা কিছু রুগ্ন মানুষ যারা কখনও মটর গাড়িতে উঠে নাই। গরুর গাড়ি কিংবা ঘোড়ার গাড়ি যাদের স্বপ্নের বাহন। শুধু বিয়ের দিন যে মানুষগুলো পালকিতে উঠতে পারে। সে রকম একটা গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত এক যুবকের পক্ষে জমিদার কন্যার স্পর্শ আশা করা অসম্ভব শুধু নয় রীতিমত অন্যায়। তবুও কেন জানি সুস্মিতার ভাবনা থেকে আমি এক মুহূর্তের জন্যও বেরিয়ে আসতে পারি না।

আজ সুস্মিতার রেজাল্ট বের হয়েছে। সে কলকাতা বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে সপ্তম স্থান পেয়েছে। আমি বোর্ড থেকে ওর রেজাল্ট এনে সোজা সুস্মিতার ঘরে গেলাম। সুস্মিতা তখন আরাম কেদারায় বসেছিলো। আরাম কেদারা থেকে দাঁড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলল, আমি ভালো করবো কিন্তু এতো ভালো করবো বুঝিনি। কিন্তু দেখো এমন দিনে আমার মা বাবা দাদা আমার কাছে নাই। কাকাবাবু কাকিমা আমাকে নিজের মেয়ের মতো আদর করে, তবুও কেন জানি মনে হয় আমি বড় একা। তুমি যেদিন আমাদের বাড়িতে এলে সেদিন মনে হয়েছিলো পূর্ববঙ্গ থেকে আমার আপন কেউ এসেছে। যে আমার সমস্ত একাকিত্বকে দূর করে দেবে।

সুস্মিতার কপালে চুমু খেয়ে বললাম, নিজেকে কখনও একা ভেবো না। আমি আছি তোমার পাশে। আর একটা জিনিস ভাবতে পারো কাকা ও কাকিমার কথা। কলকাতায় এত বড় বাড়ি বিশাল সম্পদ অথচ কোনো সন্তান নাই। উনাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন তুমি। তুমি না থাকলে অসহায় মানুষ দুটির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে অক্সিজেনের অভাবে। তুমি কাকা-কাকিমার অক্সিজেন। তোমাকে গড়ে তুলতে কাকাবাবু দিনরাত পরিশ্রম করেন। সম্পদ অর্জন করেন। কাকিমা কাকাবাবুর সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনা হাসি কান্না সবই তোমাকে ঘিরে।

সুস্মিতা বলল, তবুও আমি আমার হৃদয়ের কোথায় যেন শূন্যতা অনুভব করি।

সুস্মিতাকে বললাম, চলো কাকিমার ঘরে যাই। কাকিমার ঘরে যেতেই কাকিমা সুস্মিতাকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো। আমি কাকিমাকে এমনভাবে কখনও কান্না করতে দেখি নাই। কাকিমা বলল, তুই আজ সারাক্ষণ আমার চোখের সামনে বসে থাকবি। কোথাও যাবি না। সুস্মিতা আচ্ছা বলে কাকিমার পাশে বসে রইলো।

কাকাবাবুকে দেখা স্বপ্নের মত ব্যাপার তবুও আজ একটু পর কাকা বাবু আসলেন। হাতে মিষ্টির হাঁড়ি। হাঁড়ি থেকে মিষ্টি সুস্মিতাকে একটা খাইয়ে দিয়ে বললেন, তোর বাবা-মা আর বিলেতে তোর দাদাকে তারবার্তা পাঠিয়েছি এই বলে Out standing result by Shusmita.

তোর বাবাকে জানিয়ে দিয়েছি সুস্মিতাকে আমি ডাক্তারি পড়াব। সে দেশের সেরা ডাক্তার হবে, সব জায়গায় ওর নাম ছড়িয়ে পড়বে। আমার তো টাকার কোনো

অভাব ভগবান রাখে নাই। সুস্মিতা যেখানে পড়বে আমি ওকে সেখানেই পড়াবো। যদি বিলেতে পড়তে চায় আমি সে ব্যবস্থাও করবো। বলতেই কাকার চোখ ভিজে গেলো কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে এলো। এমন রাশভারি মানুষ শিশুর মত আচরণ করতে পারে আমার জানা ছিলো না। সুস্মিতা, কাকিমা এবং কাকাবাবুকে একান্তে কথা বলার পরিবেশ তৈরির জন্য আমার ঘরে চলে এলাম। ঘরে এসে আমি সুস্মিতার আচরণ নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। মেয়েটি হঠাৎ কেন আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন করে কান্না করলো? সুস্মিতা কি আমাকে অন্য রকম ভাবে পেতে চায়। কীভাবে পেতে চায়? আজকের এই আচরণ কি শুধুই ওর একাকিত্ব নিরসনের চেষ্টা। নাকি একাকিত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য নিরাপদ কোনো আশ্রয় খোঁজা। কি থাকতে পারে এর পেছনে?

আমিও এর কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পেলাম না। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম এ নিয়ে আর ভাবব না। এক সময় বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সারারাত সুস্মিতার স্পর্শ অনুভব করলাম। একেবারের জন্যও চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। শেষ রাতে শিয়ালদা স্টেশন থেকে হুইসেল দিয়ে একের পর এক ট্রেন ছুটতে শুরু করেছে। রাতের নিরবতা গ্রাস করেছে শহরকে। এক সময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর সুস্মিতা বেথুন কলেজে এফ.এ. ক্লাসে ভর্তি হয়। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর সুস্মিতার আচরণে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। সে প্রতিদিন পড়ার টেবিলের পাশে নানা রকম ফলের জুস সাজিয়ে রাখে। কাকিমা মাঝে মধ্যে পায়েস, পিঠা, লুচি ভেজে নিয়ে আমাদের পাশে কিছুক্ষণ বসে পড়া কেমন চলছে এ বিষয়ে কথা বলে। সুস্মিতা আজকাল আমাকে অভিভাবকের মতো পরামর্শ দেয়। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে নিয়ে আসে বেশি দুধ দিয়ে চা করে।

আজ চা খেতে খেতে সুস্মিতা বলল, কলেজে তোমার কোনো সহপাঠীর সাথে কথা হয় না? আমি বললাম, দু'জনের সাথে কথা হয়। মঞ্জুরী আর নিরুপমার সাথে সামান্য আলাপ পরিচয় আছে। ওদের মধ্যে মঞ্জুরীর পারিবারিক অবস্থা খুব একটা ভালো না। ওর বাবা নিউ মার্কেটের একটা টেইলারিং হাউজে সেলাইয়ের কাজ করে। পাঁচ ভাই বোনের সংসার। ওদের কষ্ট করে চলতে হয়। এরপর সুস্মিতা বলল, মঞ্জুরীকে তোমার পছন্দ? আমি বললাম, সে রকম কিছু না। একসাথে কলেজে পড়ি এই যা। মঞ্জুরীর বিয়ে ঠিক হয়েছে। ছেলে দিল্লিতে রেলওয়ের টিকেট চেকার।

পরীক্ষার পরপর ওর বিয়ে। ছেলে পক্ষ পাকা কথা দিয়ে গেছে। আমরা বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে বলেছিলাম। মঞ্জুরী বলেছে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা খুব একটা বড় করে করতে পারবে না ওর বাবা। এজন্য তোদের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে পারবো না। কথাগুলো বলে মঞ্জুরী বেশ ইতস্ততবোধ করছিল। আমি বলেছিলাম, এ নিয়ে কষ্ট পাবি না। আমাদের মাঝে অনেকের অর্থকষ্ট আছে, কিন্তু কখনও বলে না। তুই বলেছিস এটা তোর সরলতা।

আমার কথাগুলো শুনে সুস্মিতার ঠোঁটের কোণে এক ধরনের মিষ্টি হাসির রেখা আবিষ্কার করলাম। এরপর সুস্মিতা বলল, আর কাউকে তোমার মনে ধরে না? আমি বললাম, মনে ধরে কিন্তু আমি তাকে কোনোদিন বলতে পারবো না। সুস্মিতা জিজ্ঞেস করলো সে কে? আমি বললাম, আমি এর বেশি তোমাকে বলতে পারবো না। বাঙালি ছেলে-মেয়েরা মাঝে মাঝে এমন কিছু বিষয়ের সাথে জড়িয়ে পড়ে যাকে শুধু অনুভব করা যায়। কাছে পাওয়া যায় না। আমি অজপাড়া গাঁয়ের এক ছেলে। অর্থ বিত্তের সীমাহীন কষ্টে বড় হয়েছি। চাঁদকে স্পর্শ করার স্বপ্ন আমার জন্য শুধুই দুঃস্বপ্ন।

সুস্মিতা বলল, ঋতুচক্রে মাঝে মাঝেই চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছে চলে আসে, তাকে অনুভব করতে হয়। সুস্মিতার পড়ার চাপ খুব একটা নাই। তবুও আমার পাশে পড়ার টেবিলে বই নিয়ে বসে থাকে। বিজ্ঞান কিংবা অংকের জটিল বিষয়গুলো ঠেকে গেলে কখনও আমাকে কিছু বলে না। হঠাৎ বই বদলাতে দেখলে আমিই জিজ্ঞেস করি, কোন বিষয়টি বুঝতে পারছো না। সে তখন আমাকে বলে। আমি সমাধান করে দিয়ে বলি, আমাকে জিজ্ঞেস করো না কেন? সুস্মিতা বলে, সামনে তোমার পরীক্ষা আমার জন্য যদি তোমার পরীক্ষা খারাপ হয় এজন্য কিছু জিজ্ঞেস করি না। আমি বললাম, পরীক্ষা ভালো হবে কোনো চিন্তা করো না। সুস্মিতা বলল, তোমার পরীক্ষার সাথে তোমার ভবিষ্যতের অনেক কিছু জড়িয়ে আছে। সুজনপুর থেকে যে কারণে এসেছো সেটার প্রতি সুবিচার করতে হবে তোমার ভালো রেজাল্টের মাধ্যমে। আমি বললাম, আশা করি ভালো হবে।

আজ আমার পরীক্ষা শুরু। কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি। এমন সময় কাকাবাবু আর কাকিমা আমার ঘরে এসে আমার হাতে অনেক টাকা আর ৬টা মার্কার কলম দিয়ে বললেন, আবু বকর তুমি পরীক্ষায় ভালো করবে এটা আমরা জানি, কিন্তু আমরা চাই তুমি সেরাদের সেরা হবে। তোমার বাবা আমার ভাইয়ের কাছে প্রতিদিন তোমার খবর জানতে চান। আমি জানিয়ে দিয়েছি তোমার কোনো অযত্ন হচ্ছে না। এরপর সুস্মিতা আমাকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল, ভয় পেয়ো না। তুমি নিশ্চয়ই ভালো করবে।

প্রতিদিন পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পর দেখি সুস্মিতা আমার জন্য সদর দরজায় দাঁড়িয়ে। প্রতিদিন একই প্রশ্ন, কেমন হল? আমি বলি, ভাল।

দেখতে দেখতে আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলো। যেদিন পরীক্ষা শেষ সেদিন রয়েল এয়ারফোর্সের কয়েকজন ইংরেজ অফিসার কলেজে এসে প্রিন্সিপাল স্যারকে বললেন, এয়ারফোর্সে ভর্তির জন্য কলেজের ছেলেদের পরীক্ষা নিতে চাই। স্যার রাজি হয়ে পরীক্ষা চলার সময় আগ্রহী ছাত্রদের হলরুমে থাকার পরামর্শ দিলেন। বিমান বাহিনীতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার খুব একটা ছিলো না তবুও দেখি না কেমন হয়, এই চিন্তা করে হল রুমে গেলাম। একজন ইংলিশ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে আমাদের ৬০ জনকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত

করলেন। আমি নির্বাচিতদের মধ্যে একজন। এরপর হলো লিখিত পরীক্ষা। সেখানে চারজনকে নির্বাচিত করলো।

বাড়ি ফিরে কাকাবাবু, কাকিমা এবং সুস্মিতাকে আমার রয়েল এয়ারফোর্সে নির্বাচিত হওয়ার খবর জানালাম। কাকাবাবু কাকিমা বললেন, তুমি পারবে আমরা জানতাম। সুস্মিতা বলল,ভালো করেছো, তবে বিষয়টি নিয়ে ভালো করে ভাবতে হবে। আসলে তোমার ট্যালেন্ট তুমি কোথায় কাজে লাগাবে।

আমি বললাম, সুস্মিতা, সুযোগটা আমার জন্য অনেক বড়। খুব কম মানুষ এমন সুযোগ পায়। সুস্মিতা বলল, ঠিক আছে তুমি তোমার বাবা-মার সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিতে পারো। আমি বললাম, ঠিক আছে আজই আমি সুজনপুর যাবো।

টানা গাড়ি, স্টিমার, লঞ্চ এরপর নৌকা এভাবেই এক সময় সুজনপুর গ্রামে পৌঁছলাম। অনেকদিন পর মনে হলো আমি আমাকে খুঁজে পেয়েছি। বাড়ির সামনে যাওয়ার পর দেখলাম বাড়িতে একটা নতুন কবর। কবরের পাশে বাবজান দাঁড়িয়ে চোখের পানি ফেলছেন। আমি বাবজানের পাশে যেতেই বাবজান আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। এরপর বললেন, এটা তোমার মায়ের কবর। বাবজানের কথা শুনে আমি আমার চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে এসে বাবজানকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছিল আমার মায়ের? বাবজান বললেন, সেদিন পানি আনার জন্য ইন্দারায় যাওয়ার সময় একটা গোখরা সাপ ছোবল মারে। স্থানীয় ওঝা চান মিয়াকে ডেকে আনলাম। চান মিয়া অনেক ঝাড়ফুক করে বিষ নামিয়েছে। কিন্তু তোমার মার ফর্সা মুখ বিষের জ্বালায় একেবারে নীল হয়ে গেছিলো। জামিদার বাবু শুনে বললেন, ওঝা বৈদ্য দিয়ে কোনোদিন বিষ নামানো সম্ভব না। এখন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। ইনজেকশন দিলেই বিষক্রিয়া চলে যায়। আবু বকরের মাকে কুমুদিনী হাসপাতালে নিয়ে যান। আমি কুমুদিনী হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর বললেন, আপনি অনেক দেরী করে ফেলেছেন। সাপ যেখানে কেটেছিলো তার ওপরে বেঁধে রাখলে বিষ সারা গায়ে ছড়াতে পারতো না। আমি বললাম, জমিদার বাবুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে যে ডাক্তার আছেন তিনি চিকিৎসা করতে পারতেন না। বাবজান বললেন, একজন এলএমএফ ডাক্তারের পক্ষে

কতটুকু চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায়। একজন এমবিবিএস ডাক্তার থাকলে ভালো হয়। বড় বাবুকে বলেছি তাঁর হাসপাতালের জন্য কলকাতা থেকে একজন এমবিবিএস ডাক্তার আনার জন্য। তিনি বলেছেন, কলকাতার কোনো ডাক্তার এই অজপাড়া গাঁয়ে আসতে চায় না। আমাদের এখানকার কোনো ছেলে যদি ডাক্তারি বিদ্যায় শিক্ষিত হয় তবেই তাঁকে এখানে রাখা যাবে।

আমি বাবজানকে বললাম, আমি এয়ারফোর্সে চান্স পেয়েছি কিন্তু আমি ডাক্তারি পড়তে চাই।

বাবজান বললেন, চল বড়বাবুকে বলি। তিনি নিশ্চয় একটা পরামর্শ দিবেন।

বাবজান আমাকে জমিদার কালিকুমার সেন চৌধুরীর কাছে নিয়ে গেলেন, আমাকে দেখে জমিদার বাবু বললেন, আবু বকর দাদার বাড়িতে তোমার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে? আমি বললাম, কাকাবাবু, কাকিমা আমার অনেক যত্ন করেন। এরপর বড়বাবু বললেন, আমার মেয়ে সুস্মিতা কেমন আছে? তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, মেয়ের জন্য সবসময় শুধু কান্নাকাটি কর। আবু বকরের কাছে জিজ্ঞেস করো মেয়ে কেমন আছে?

আমি বললাম, আপনার মেয়ে খুব ভালো আছে। মাঝে মাঝে আপনার কথা মনে করে। তবু কাকাবাবু কাকিমার কথা ভেবে কাউকে কিছু বলে না। এরপর আমি জমিদার বাবুকে বললাম, বড় বাবু আমি রয়েল এয়ারফোর্সে নির্বাচিত হয়েছি। শুনে অবাক, বললেন এটাতো দারুণ খবর। আমি বললাম, কিন্তু আমি ডাক্তার হতে চাই। সুজনপুরে একজন ভালো ডাক্তার থাকলে আমার মা বেঁচে থাকতেন। বড় বাবু বললেন, তোমার কথা ঠিক, তোমার জন্য আমি কি করতে পারি? আমি বললাম, বিলেতে ডাক্তারি খরচ জোগাড় করা সম্ভব হবে না। এজন্য আপনার পরামর্শের জন্য এসেছি। জমিদার বাবু বললেন, তোমার বাবজানের পক্ষে টাকা জোগাড় করা সম্ভব না হলে চাকরি করে শোধ করবে। আপাতত আমি তোমাকে দেবো। তুমি বিলেতে ভর্তির চেষ্টা করো। প্রয়োজনে আমার ছেলে অরবিন্দ সেন চৌধুরী ওখানে ব্যারিস্টারি পড়ছে, ওর জন্য সাহায্য নিতে পারে।

জমিদার বাবুর আশ্বাস শুনে বাড়ি ফিরলাম। দুদিন পার হতেই সুস্মিতার কথা খুব মনে পড়ছে। তবুও বাবজানের পাশে কয়েকদিন থাকা প্রয়োজন মনে করলাম। বাবজানকে রান্না করে খাওয়ান আমাদের রাখাল কাদের মিয়া। উনার রান্নার হাত খুব একটা ভালো না। কখনও লবণ কম, কখনও ঝাল বেশি। কখনও ভাত নরম, কখনও ভাত শক্ত। তবুও খেয়ে বেঁচে থাকা যায় আর কি? কিছু দিন যাওয়ার পর বাবজান অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরলেন। আমি বললাম, বাবজান আমার কলকাতা যাওয়া প্রয়োজন, ডাক্তারি ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

বাবজান বললেন, জমিদার বাবুর ওখানে ভালোই বেতন পাই। তোমাকে বলা হয়নি, এর মধ্যে আমি বিলেতে তোমার ডাক্তারি পড়ার টাকা জোগাড় করেছি। বাবজানের কথায় বেশ আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করলাম। আমি বললাম, অনেক কষ্ট

করে জমিজমা কিনেছ, সেটা থাক। বড় বাবুর ওখানে যে বেতন পাবে সেখান থেকে আস্তে আস্তে পরিশোধ করবে। যদিও কি পরিমাণ টাকা খরচ হবে আমার জানা নাই। যাওয়ার পর বুঝতে পারবো।

পরের দিন আমি কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। বাবজান আমাকে বিনানয়ের ঘাটে এসে স্টিমারে তুলে দিলেন। পদ্মা, যমুনা, গঙ্গা, ভাগীরথি বঙ্গোপসাগর পার হয়ে কলকাতা বন্দরে নামলাম। আমি কাকা বাবুকে পত্র দিয়ে আমার আসার খবর জানিয়েছিলাম। কলকাতায় পৌঁছে দেখলাম সুখলাল বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সুখলালকে বললাম, কেইছে আপ? সুখলাল বললেন, আচ্ছা হায়। এরপর টানা গাড়িতে সোজা পার্কস্ট্রিটের কাকাবাবুর বাড়ি। বাড়ির সদর দরজায় আসার পর দেখলাম কাকিমা আর সুস্মিতা দাঁড়িয়ে। কাকিমা বললেন, আবু বকর ভালো আছো তো? আমি বললাম, ভালো। সুস্মিতা কোনো কথা বললো না। আমার ঘরে এসে শুধু বলল, এতো দেরী করলে কেন? আমার বাড়ি, মায়ের মৃত্যু, জমিদার বাবু, সুস্মিতার মার কথা জানালাম। সুস্মিতা মায়ের কথা শুনে হঠাৎ কান্না করে বললো, আমার মা ভালো আছেনতো?

আমি বললাম, ভালো আছেন।

এরপর আমি বিলেতে ডাক্তারি পড়ার বিষয়টি বললাম। সুস্মিতা বলল, বাবা কাকাবাবুকে জানিয়েছেন, কাকাবাবু আমার বড়দাকে ভর্তির ব্যবস্থা করার জন্য বলেছেন। বড়দা তোমার সার্টিফিকেট পাঠাতে বলেছেন। ভর্তির প্রক্রিয়ার পর এফ.এ. ক্লাসের নম্বরপত্র পাঠাতে হবে। তাহলে রয়েল এয়ারফোর্সের ভবিষ্যত কি? আমি বললাম, ঐখানে আর যাচ্ছি না। সুস্মিতা বলল, আমার মনে হয়েছিল, বিমান বাহিনীতে ভর্তি হলে বিমান চালানোর সময় প্লেন ক্রাস করে তুমি মারা যাবে। আমি মনে মনে চেয়েছিলাম তুমি যেন এয়ারফোর্সে না যাও। ভগবান আমার কথা শুনেছেন। এজন্য তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

তারপর সুস্মিতা বলল, তোমার সান্নিধ্যে আমি আমার একাকিত্ব ভুলে গেছিলাম। তুমি বিলাত গেলে আমি আবার একা হয়ে যাবো। আমি বললাম, তুমিও ডাক্তারি পড়তে বিলাত যাবে তখনতো আবার দেখা হবে। সুস্মিতা বলল, আমি ডাক্তারি পড়বো এটা কি করে জানলে?

– আমি জানি তুমি সেটাই চাও। মানব সেবার জন্য তুমি এই পৃথিবীতে এসেছো। সেবা দিতে না পারলে তোমার জন্মই যে বৃথা হবে। সুস্মিতা বলল, এবার চলো খেয়ে নেবে। অনেক ধকল গেছে। বিশ্রাম প্রয়োজন। সুস্মিতা আর আমি খাবার ঘরে খেয়ে যেয়ে আমার ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। এতো পরিশ্রমের পরও আজ কেন জানি আমার চোখে ঘুম আসছে না। জেগে থাকতে ইচ্ছে করছে। ক্লান্তি আমাকে জেগে থাকতে দিলো না।

আজকাল খুব একটা পড়ালেখায় মনোযোগ দিতে পারি না। ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে হয়তো পড়ালেখায় মনোযোগী হওয়া যাবে। সুস্মিতা আমার সব কাগজ পত্র

বিলেতে পাঠিয়েছে ওর বড়দার কাছে। বড় দা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে অক্সফোর্ড লন্ডন মেডিকেল কলেজে আবু বকরের ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এফ.এ. পাসের নম্বরপত্র প্রয়োজন হবে। এজন্য রেজাল্ট বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই। এখন আমার হাতে অনেক সময় এজন্য সুস্মিতা সকালে যখন বেথুন কলেজে যায় আমিও ওর সাথে বেরিয়ে যাই। ওকে কলেজে দিয়ে কলেজ রোডের লাইব্রেরিগুলোতে মেডিকেলের বই পড়ি। কলকাতার ইমপেরিয়াল লাইব্রেরির বইয়ের সংগ্রহ ভালো। বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্প, সংস্কৃতি এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংগ্রহ ব্যাপক। লাইব্রেরিতে বসে পড়ার পরিবেশও ভালো। লাইব্রেরিতে পড়ার জন্য আমি একটা কার্ড করে নিয়েছি। প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর অবধি বই পড়ি।

দুপুরের পর বেরিয়ে বেথুন কলেজে যাই। সুস্মিতাকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হই। কখনও কখনও হাওড়া ব্রিজ, রবীন্দ্রসদন, সায়েন্সসিটি, নিউমার্কেট, বড় বাজার, শিয়ালদা স্টেশনে যাই। কিছু সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরি। কাকিমা আজকাল বিষয়টা লক্ষ্য করেন বলে মনে হয়। একদিন কাকিমা আমাকে ডেকে বললেন, আবু বকর আজকাল তোমাদের বাড়ি ফিরতে দেরী হচ্ছে। বিষয়টি লক্ষ করার মত। সুস্মিতা কিংবা তোমাকে সামনে পাড়ি দিতে হবে অনেক পথ। ওর বাবা এবং কাকার সুস্মিতাকে নিয়ে অনেক বেশি প্রত্যাশা। কোনো কারণে সেই অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে স্থানচ্যুত হলে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। আশা করি তুমি বিষয়টা আন্দাজ করতে পারো। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে তোমাকে অনেক কিছু ভেঙে বলতে হবে না।

কাকিমার কথা শুনে আমি যেন কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তব জীবনে ফিরে এলাম। সত্যি তো আমি কোনো এক অলিক স্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছি? অসম্ভবকে সম্ভব করার এ কোন দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুস্মিতা আর আমার মাঝে যোজন যোজন ব্যবধান। সর্বোপরি এ শতাব্দীর ভয়াবহ ধর্মীয় বিরোধ পাশ কাটিয়ে অন্যরকম এক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম এই উপমহাদেশে অসম্ভব। যেই সমাজ ব্যবস্থায় কোন মুসলিম ছেলে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে থাকাতো দূরের কথা ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। কোনো মুসলিম ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করলেই শুদ্ধ হওয়ার জন্য গঙ্গা স্নান করতে হয়। এই রকম ব্রাহ্মণবাদী সমাজে হিন্দু মুসলিম একত্র বসবাস একটি ঘোরতর অপরাধ। সেই সাথে দৃশ্যমান আর্থিক বৈষম্য। ঝলকানো আলোর পাশে নিভুনিভু এক মাটির প্রদীপ। আমি দৃঢ়ভাবে নিজেকে সংযত করার পরিকল্পনা নিলাম।

সুস্মিতার বয়স কম। ওর ভেতর রয়েছে ছেলেমানুষী আবেগ। ছোটবেলা থেকে বাবা মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য ওর ভেতরে একধরনের অসহায়ত্ব রয়েছে। রয়েছে একাকীত্ব। এজন্য ওর যে কোনো একটা আশ্রয় অবলম্বন করে বেঁধে থাকতে চায়। যদিও খুবই বুদ্ধিমতি এবং আগামী ভাবনা ওকে অনন্ত পথ চলার অনুপ্রেরণা দেয়। তবুও আবেগ মানুষের স্বাভাবিক বিবেচনা বোধকে নিষ্ক্রিয়

করে। সুস্মিতার ভেতর মাঝে মাঝেই আবেগ কাজ করে তখন বুদ্ধি তার দক্ষতা হারিয়ে ফেলে। এ বিষয়ে আমাকে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হবে। তা না হলে যে কোনো বিরূপ পরিস্থিতির আবির্ভাব হতে পারে।

আজ আমার পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে। সেন্ট জেভিয়ার্ড কলেজের এ যাবত কালের সেরা নম্বর নিয়ে আমি এফ.এ. পাস করেছি। বিকেলে আমি বাড়ি ফিরে দেখি সুস্মিতা আমার ঘরে আলো নিভিয়ে বসে আছে। আমি ঘরে ঢুকতেই আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটে দিল গভীর এক চুম্বন। তখন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমি ওর বাহু থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারছি না। আমিও কখন ওকে জড়িয়ে ধরেছি বুঝতে পারিনি। মনে হলো আমরা মাইলের পর মাইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হচ্ছি। এমন সময় কাকিমার গলার আওয়াজ শুনে আমরা ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মত নিজেদের আলাদা করে ফেললাম। কাকিমা ঘরে ঢুকে বললেন, আবু বকর তুমি সত্যিই খুব মেধাবী, তোমার সম্পর্কে যত বলা যায় ততই কম। এখানে ধনাঢ্য পরিবারের সন্তানেরা কত রকম সুবিধা পায়। অথচ তুমি সাধারণ একটা গ্রামের ছেলে কি অসামান্য তোমার মেধা। আজ বল তুমি কি কি খেতে চাও? আজ তোমার পছন্দের সবকিছু বাবুর্চিকে রাঁধতে বলব। আমি কাকিমাকে বললাম, এসবের কোনো প্রয়োজন নাই। কাকিমা বললেন, কিছু চাইতে হবে। আমি বাধ্য হয়ে বললাম, পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজি করতে পারেন। কাকিমা বললেন, কলকাতায় পদ্মার ইলিশ খুব একটা পাওয়া যায় না। তবুও আমি বাজার সর্দারকে বলে দিচ্ছি যে কোনো ভাবেই হোক সে পদ্মার ইলিশ জোগাড় করবে। এই বলে কাকিমা চলে গেলেন।

কাকিমা যাওয়ার পর সুস্মিতাকে বললাম, সুস্মিতা আমরা যে পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছি, পথ খুবই বন্ধুর। সে পথের প্রতিটি বাঁকে রয়েছে সীমাহীন প্রতিবন্ধকতা। আমাদের মাঝে নেই কোনো সাদৃশ্য, আছে সীমাহীন বৈসাদৃশ্য। আমাদের জন্য অপেক্ষমান ভয়ঙ্কর এক সাইক্লোন। যে সাইক্লোন লণ্ডভণ্ড করতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কথাগুলো শুনে সুস্মিতা বলল, আমি অতকিছু ভাবতে পারি না। আমি শুধু ভাবি আমার ভালোলাগা, যা আমাকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়। সুস্মিতার কথা শুনে মনে হলো এই মেয়েটি যেই উদ্দেশ্য নিয়ে পথ চলতে শুরু করেছে, তাকে রোধ করা সম্ভব হবে না। এজন্য ভয়ঙ্কর কোনো কিছু হয়ে যাওয়ার আগেই আমার সরে যাওয়া প্রয়োজন। যত তাড়াতাড়ি পারি ততই মঙ্গল।

অনেকদিন পর রাতের খাবারের টেবিলে কাকাবাবু বললেন, আবু বকর তোমার ভর্তির প্রক্রিয়ার জন্য এফ.এ. ক্লাসের নম্বর পত্র পাঠাতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পারো ততই ভালো। আমি অরবিন্দ সেন চৌধুরীকে বলেছি দ্রুত ভর্তির ব্যবস্থা করতে।

কাকিমা ইলিশ মাছ ভাজিসহ নানা রকম খাবার আয়োজন করেছেন। সাথে পায়েস। আমি খেয়ে আমার ঘরে চলে এলাম। আমার ঘর থেকে সুস্মিতার ঘর

দেখা যায়। সুস্মিতা আরাম কেদারায় বসে আছে চোখ বন্ধ করে। আমি সুস্মিতার আজকের কাণ্ডটি অকস্মাৎ নাকি পরিকল্পিত বুঝতে পারছি না। আমারও কেন জানি মাঝে মাঝে ভাবতে ইচ্ছে করে, কি অমন ক্ষতি হয় যদি দুইজন মানুষ নিজেদের পছন্দের মেলবন্ধন ঘটাতে পারে? আমাদের এই সমাজ কি সেটা মেনে নেবে? এটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

অক্সফোর্ড লন্ডন মেডিকেল কলেজে আমার ভর্তির কাগজপত্র চলে এসেছে। কাকাবাবু কাকিমা আমাকে ডেকে তাদের ঘরে নিয়ে বললেন, আবু বকর বিলাত খুব ঠাণ্ডা শহর। ভারত উপমহাদেশের কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। কত বেশি ঠাণ্ডা। তোমার জন্য কয়েকটা কোর্ট এবং একটা ওভার কোর্ট কিনেছি। সাথে নিয়ে যাবে। হিত্রো বিমান বন্দরে আমার ভাতিজা অরবিন্দ সেন চৌধুরী তোমাকে নিতে আসবে।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছো সে বিষয়ে পূর্ণ মনোনিবেশ দিবে। একটা জিনিস মনে রাখবে অক্সফোর্ড লন্ডন মেডিকেল কলেজে সারা দুনিয়ার সব সেরা ছাত্ররা ভর্তি হয়। তাদের সাথে পাল্লা দিয়েই তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। কাকাবাবুর কথা শুনে আমার ঘরে এসে চুপ করে বসে আছি। সুস্মিতাকে ছেড়ে যেতে হবে এই কষ্ট আজকাল আমাকে বিষণ্ন করছে। মাঝে মাঝে মনে হয় এই তো ভালো আছি। প্রয়োজন কি বিলাত যাওয়ার, মায়ের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর বিষয়টি আমি মেনে নিতে পারি না। সুজনপুরের অসংখ্য মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যায় শুধুমাত্র একজন ডাক্তারের অভাবে। এজন্য হলেও আমাকে বিলাতে যেয়ে ডাক্তার হতে হবে।

এসব ভাবতে ভাবতে আমি চুপচাপ ঘরে বসে আছি। এমন সময় সুস্মিতা আমার ঘরে ঢুকলো। পরনে লাল শাড়ি, চুল ফিতা দিয়ে বেণী করা। চোখে কাজল, মুখে মনে হয় পাউডার লাগিয়েছে। সুস্মিতা এমনিতেই অপূর্ব সুন্দরী। সাজগোজ করলে সুস্মিতাকে পরীর মত সুন্দর লাগে। যদিও আমি কোনোদিন পরী দেখি নাই। পরী কি সুস্মিতার মতই দেখতে সুন্দরী? হলেও হতে পারে। এ বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নাই।

সুস্মিতা বলল, কাল তুমি চলে যাবে। আর কোনোদিন দেখা হবে কি না, জানি না। বিলাতের মেয়েরা খুব সুন্দর। বিলাতি মেয়েদের পেয়ে আমাকে কি ভুলে যাবে? এ প্রশ্নের কোন উত্তর আমার জানা নাই। তবুও বললাম, সুস্মিতাকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে কোনোদিন সম্ভব হবে না। আমার কথা শুনে সুস্মিতা আমাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলো। আমার গালে একের পর এক চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিলো। আমি সুস্মিতাকে কোনো প্রকার বাধা দেয়ার চেষ্টাও করলাম না। সুস্মিতা বলল, একদিনের জন্য হলেও আমি তোমার বউ হতে চাই। তুমি আমাকে তোমার বউ হিসেবে গ্রহণ করো। সুস্মিতার এই অন্যায় আবদার আমি কেমন করে মেটাবো। ভাবতে ভাবতে আমিও সুস্মিতার মায়াজালে আচ্ছন্ন হলাম। আমাদের

শারীরিক দূরত্ব এমনিতেই ছিলো না। কখন যে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে বুঝতে পারছি না। হঠাৎ সুস্মিতা আমাকে সজোরে সরিয়ে দিয়ে বলল, এটা নৈতিক নয়, আমাদের সংযত থাকতেই হবে। ভুল করলে ভবিষ্যতে আমরা নিজেদের দিকেই তাকাতে পারবো না।

পাশের মন্দির থেকে তখন ঘণ্টা ধ্বনি ভেসে আসলো। বুঝতে পারলাম আঁধার নেমে এসেছে। ততক্ষণে আমরা দুজনেই মারাত্মক এক দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচতে সক্ষম হয়েছি। সুস্মিতা আমার চোখের ওপর চুমো খেয়ে বললো, আজকের এই সাঁঝের বেলাটা আমার সারা জীবনের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে। তুমি যত দূরেই থাকো জানবে আমি তোমার পাশেই আছি। অনেকদিন তোমার পরশ আমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে।

আমি বললাম, তুমি তো ডাক্তারি পড়ার জন্য বিলাতেই যাবে। আমাদের এই বিচ্ছেদ খুব একটা লম্বা হবে না।

সুস্মিতা চলে যাওয়ার পর আমি ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। পারলাম না। বারবার আমার মনে হলো সুস্মিতা আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে। আমি চেষ্টা করেও ওর বাহু থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারছি না। যদিও দুয়ের মাঝে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় যে ব্যবধান রয়েছে সেটা কি করে কাটিয়ে উঠবো। আর ভাবতে পারছি না। ভবিষ্যতকে ভবিষ্যতের ওপর ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আজ আমার বিলাত যাত্রা। সকালে কাকাবাবু, কাকিমা, সুখলাল, বাজার সর্দার সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সুস্মিতা আমার সাথে দমদম বিমান বন্দরে আসল। সুস্মিতার চোখ কাল থেকেই ভেজা ছিলো। আমি ওর গভীর কালো চোখ দুটি একবারও দেখতে পারলাম না। গাড়ি থেকে নামার সময় শুধু বললাম, তুমি ভালো থেকো। তুমি ভালো থাকলেই আমিও ভালো থাকবো। আজ কেন জানি মনে হলো আমরা অল্প সময়ের মধ্যে দমদম বিমান বন্দরে চলে এসেছি। পার্কস্ট্রিট থেকে বিমান বন্দর অনেক দূরে হলে কি ক্ষতি হতো? বিমান বন্দরের লাউঞ্জে যেয়ে ইমিগ্রেশন শেষে সুস্মিতার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সুস্মিতার চোখ তখনও ভেজা ছিলো। ওর চোখটাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। কান্না জড়িত কণ্ঠে শুধু বলল, ভালো থেকো।

আমি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা বিমানে উঠলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমান ছুটতে ছুটতে নীল আকাশে উঠে গেলো। তখন কলকাতা কিংবা আমার প্রিয় সুজনপুর আর চোখে পড়ে না। আকাশে শুধুই সাদা সাদা মেঘ কখনও অনেক বেশি কখনও কম। নেই কোনো পাখির আনাগোনা। মেঘের ভেলারা ছুটে যাচ্ছে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। ছুটতে ছুটতে বিমানটি আছড়ে পড়লো বিমান বন্দরে। আমার পেছনে পড়ে রইলো চিরচেনা সুজনপুর, কলকাতা আর আমার

হৃদয়ের খুব কাছের সুস্মিতা সেন চৌধুরী। যার সান্নিধ্য আমাকে আগামী দিনের স্বপ্ন রচনায় অনুপ্রেরণা দেয়।

কলকাতার ক'টি বছর আমার জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে নতুন সাজে সাজিয়েছে। আমি এখন কেবলই আমি নই। আমার অস্তিত্বের মাঝে সুস্মিতার অস্তিত্ব আমি প্রতিনিয়ত খুঁজে পাই। ওকে আমি ভুলে যাবো কেমন করে?

আকাশের মেঘের খেলা দেখতে দেখতে এক সময় বিমানটি বিমান বন্দরের মাটি স্পর্শ করলো। আমি এয়ার হোস্টেজকে জিজ্ঞেস করলাম Have we finish our journey. এয়ার হোস্টেজ বললেন, Now, we are in dubai to collect fuel. Then we will start A long Journey for london. বিমানে কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না, গ্রাম শহর, পর্বত, বেলাভূমি, নদী, সাগর, মহাসাগর জানি না কত কি পার হয়ে বিমান এক সময় লন্ডনে হিথ্রো বিমান বন্দরের রানওয়ে স্পর্শ করলো। বিমান থেকে নেমে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে লাগেজ কাউন্টার থেকে লাগেজ সংগ্রহ করে লাউঞ্জে অভ্যর্থনাকারীদের দিকে তাকালাম। অনেকক্ষণ পর দেখলাম সুদর্শন এক যুবক প্লাকার্ড উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। প্লাকার্ডে লেখা 'MR. ABU BOKKAR'আমি এগিয়ে যেয়ে বললাম, May be you are waiting for me? অরবিন্দ সেন চৌধুরী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, Your are more then smart, what about I thing. আমি উত্তরে বললাম, Thanks for complement. এরপর দাদা আমাকে বললেন, বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, এশিয়ানদের এখানকার ঠাণ্ডা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নাই। যদিও গাড়িতে গরম হাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবুও গাড়ি পর্যন্ততো যেতে হবে। আমি দাদা বাবুকে অনুসরণ করে বিমান বন্দরের বাইরে পার্কিং লাউঞ্জে চলে এলাম। লাগেজ গাড়িতে তুলে দ্রুত গাড়িতে বসলাম। এর মধ্যেই মনে হলো ঠাণ্ডা আমাকে আকড়ে ধরেছে। গাড়িতে উঠার পর গরম হাওয়া বেশ ভালো লাগলো। দাদা বাবু গাড়ি ড্রাইভ করে যেতে যেতে বললেন, এটা বাকিংহাম প্যালেস। রানি এলিজাবেথসহ ব্রিটিশ রাজ পরিবারের সদস্যরা এই বাড়িতেই থাকেন। এরপর দাদা বাবু বললেন, এটা লন্ডন ব্রিজ, যখন ওয়াটার বাস চলে লন্ডন ব্রিজের মাঝের অংশ উপরে তুলে দেয়া হয়। ওয়াটার বাস যেন আসা যাওয়া করতে অসুবিধা না হয়। এরপর দাদা বাবু বললেন, আমরা ওয়াটার লু পার হয়ে নটিংহিল যাব ওখানেই আমি থাকি। নটিংহিল বেশ নিরিবিলি একটা আবাসিক এলাকা। রাস্তায় কোনো লোকজন নাই বললেই চলে। অনেকক্ষণ পরপর একটা দুইটা ট্যাক্সিকে আমাদের উল্টা দিক থেকে আসতে দেখলাম। বাড়ির পাশে পার্কিং প্লেসে গাড়ি রেখে দাদা বাবু গেটের দরজা খুলে আমাকে দ্রুত ভেতরে যেতে বললেন। বাড়ির ভেতরে অন্যরকম পরিবেশ। বসার ঘরের পাশেই রয়েছে ফায়ার প্লেস, বসার ঘরের এক পাশে দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ি। ওপরে দুইপাশে দুইটা রুম। দাদা বাবু বললেন, তুমি বস আমি কফি আর স্যুপ গরম করে তারপর খেতে খেতে তোমার

সাথে কথা বলবো। দাদা বাবু ফায়ার প্লেসে আরো কিছু কাঠ দিয়ে আগুনের তাপ বাড়িয়ে দিলেন। ততক্ষণে বাইরে মেঘের মত বরফ ঝরছে।

এরমধ্যেই দাদা বাবু কফি, টোস্ট আর স্যুপ নিয়ে খাবার টেবিলে বসে আমাকে ডাকলেন। আমি বসতে বলতে দাদা বাবু বললেন, সুজনপুর থেকে আসার সময় বাবা-মা তোমাকে কি বলেছেন? আমি বললাম, কাকিমা বলেছেন, আমার ছেলে অরবিন্দ খুব ভালো ছেলে, যেমন পড়ালেখায় তেমনি ভদ্রতায়। তুমি সোজা ওর ওখানেই উঠবে। আমি ওকে পত্র দিয়ে জানিয়ে রাখবো। আমি বলেছিলাম, কাকিমা আমি আপনাদের জমিদারির একজন সামান্য কর্মচারীর ছেলে, আমার কি জমিদারের ছেলের সাথে থাকা ঠিক হবে? কাকা বাবু বলেছিলেন, কর্মচারী হলেও তোমার বাবা অত্যন্ত সৎ এবং বুদ্ধিমান। তার ছেলে নিশ্চয়ই ভালো হবে?

দাদা বাবু বললেন, এসব নিয়ে তুমি ভাববে না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছো সেটা সঠিকভাবে করবে। তোমার জন্য পশ্চিমের ওপরের ঘরে থাকার ব্যবস্থা করেছি। ওখানেই থাকবে। এরপর দাদা বাবু বললেন, অনেক বড় রাস্তা পার করে এসেছো। একটা শাওয়ার দিলে ক্লান্তি দূর হবে। বাথরুমে ওয়াটার হিটার দেয়া আছে। গরম ঠাণ্ডা দুই ধরনের জলই পাবে। দাদা বাবুর কথা শুনে আমি বাথরুমে গেলাম। দ্রুত গোসল করে বেরিয়ে এলাম। এরমধ্যে দাদা বাবু ভাত, ডাল, ফিসফ্রাই টেবিলে স্যাাজিয়ে ফেলেছেন। আমাকে দেখে বললেন, এশিয়ানরা ভাত খেতে পছন্দ করে আমি জানি তুমি মনে মনে ভাত প্রত্যাশা করছো। এজন্য ভাত করেছি।

খেতে খেতে দাদা বাবু বললেন, আমি ব্যারিস্টারি কমপ্লিট করেছি। এখন সিনিয়র একজন ব্যারিস্টারের সাথে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করছি। খাওয়া-দাওয়ার পর দাদা বাবু আমাকে উপরের ঘরে যেয়ে শুয়ে পড়তে বললেন। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার পর পশ্চিমের ঘরে ঢুকে দেখলাম ফোমের বিছানায় সাদা চাদর দেয়া। বিছানার ওপর কম্বল আর দুটা বালিশ রাখা আছে। ঘরের পূর্ব দেয়ালে জানালা। কৌতূহল নিয়েই আমি জানালা খুলে দেখলাম। ঝরঝর করে বৃষ্টির মত বরফ পড়ছে। আমি বৃষ্টি পড়তে দেখেছি কিন্তু এভাবে বরফ পড়তে কখন দেখিনি। সাদা মেঘের মত বরফ পাকা রাস্তা ঢেকে দিচ্ছে। অপূর্ব সেই দৃশ্য। গাছের কোনো পাতা নাই। একেবারেই পাতা বিহীন সব বৃক্ষ। অপূর্ব এই দেশকে ফেলে ঝড়, বৃষ্টি, কাদা, ধুলা মাখা এশিয়ায় সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কেন গেছে ব্রিটিশরা আমি ভেবে পাই না। ওদের সম্পদের তো অভাব নাই। কেন তাবৎ বিশ্বের সম্পদকে লুণ্ঠন করে আনতে হবে? তাহলে কি আমাদের সম্পদ দিয়েই ব্রিটিশরা সম্পদশালী হয়েছে? এর কোনো উত্তর আমার জানা নাই। শুধু এটুকু জানি আজকাল বিলাতে না এলে কেউ প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারে না বলে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা মনে করে। সুস্মিতা কি তাই মনে করে? সুস্মিতার কথা মনে করতেই আমার হৃদয়ে লু হাওয়া বয়ে গেলো। কলকাতায় আমি তো ভালোই ছিলাম। সুস্মিতার মত অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে ছিলো আমার পাশে। আজ কেন জানি মনে হচ্ছে কলকাতার শেষ ক'টা দিন আমার জীবনে না আসলেই ভালো হতো।

একটি মেয়ে তার সমস্ত বিশ্বাস সমর্পণ করে আমার কাছে ছুটে এসেছিলো? সুস্মিতার আত্মবিশ্বাসে জোর না থাকলে ঘটতে পারতো ভয়ঙ্কর কিছু।

যেটা হলে আমি কি কোনোদিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম? এর উত্তর আমার জানা নাই। সুজনপুর গ্রামের মত অজপাড়া গাঁয়ের ছেলে সুস্মিতার মত এমন একটি সুন্দর মেয়েকে পছন্দ করবে না এটা কি হতে পারে। হয়তো আর্থিক ও সামাজিক স্বীকৃতির মাঝে রয়েছে যোজন যোজন ফারাক। তবুও অজান্তেই ভালোলাগার, যে ভালোবাসার জন্ম নিয়েছে তাকে রুখবে কে? সুস্মিতা বড় হয়েছে সীমাহীন আদর আর জৌলুসের মাঝে। সে কোনোদিন কোনো বিষয়ে না শুনেনি। তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বকে পাবার জন্য সকল শাসনের বেড়াজাল ছিন্ন করতে পারে। কাকা-কাকির সাথে থাকলেও এক ধরনের একাকীত্ব ওর হৃদয়ে জন্ম দিয়েছে এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা। বাঁধাহীনভাবেই চলতেই সে অভ্যস্ত। এমনি এক দুর্বল সময়ে আমার সাথে ওর পরিচয়, এক ছাদের নিচে বসবাস। আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম আমাদের নানাবিধ বৈসাদৃশ্যের কথা। যুক্তিহীন আবেগ পরিণত করেছে নিয়ম কানুন ভেঙে সবকিছু একাকার করার অভিপ্রায়। আমি চেষ্টা করলেও সুস্মিতার আবেগকে হয়তো সংযত করতে পারতাম না। কিন্তু আমিও যে দিনে দিনে ওকে পছন্দ করতে শুরু করেছি। আমার ভালো লাগার ভালোবাসার উপত্যকায় নীরব স্তব্ধ জলরাশি সুস্মিতার স্পর্শে ছুটে চলার অনুপ্রেরণা পেয়েছে। আমি জেগে উঠেছি অচিনপুরের রাজকন্যার জিয়নকাঠির স্পর্শে।

যদিও আমার জানা নাই এর পরিণতির কথা। তবে এটুকু জানি সুস্মিতাকে ভালোবাসবো না এমন মনের জোর আমার কোনোদিন ছিলো না।

নটিংহিলের আকাশে আলো ফুটতে শুরু করেছে। পাশের গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি বাজছে ঢং ঢং ঢং। নিঝুম রজনী আমাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। চোখ বন্ধ করতেই কখন যে হারিয়ে গেলাম বুঝতে পারিনি।

সকালে দাদা বাবু আমাকে ডেকে তুললেন, নাস্তা করে দ্রুত তৈরি হতে বললেন, আমি তৈরি হয়ে দাদা বাবুর সাথেই বের হলাম। দাদা বাবু আমাকে ট্যাক্সিতে অক্সফোর্ড লন্ডন মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলেন। কলেজের প্রিন্সিপাল ডা. স্টিফেন স্মিথের অফিস রুমে গিয়ে দাদা বাবু বললেন, Hi smith, This is Abu Bokkar come from British India for admition. স্মিথ বললেন, Yes, No Problem, I have done all the formalities Abu Bokkar supposs only to sight here. এরপর মি. স্মিথ আমাকে কিছু প্রশ্ন করলেন, আমি কেন ডাক্তারি পড়তে চাই? ডাক্তারি পড়ে আমি কি করবো? আমার বাড়িতে কে কে আছে? এমন অনেক প্রশ্ন। উত্তর দেয়ার পর তিনি বললেন, কাল থেকে থিয়েটার রুমে আমার ক্লাস শুরু। ভর্তি কাজ শেষ হওয়ার পর দাদা বাবুর সাথে বেরিয়ে এলাম। পরের দিন দাদা বাবু হাইকোর্টে যাওয়ার পথে আমাকে লিটিংটন স্টেশনে বাসে তুলে দিয়ে বললেন, আমি ৫টায় কোর্ট থেকে

ফিরে এই স্টেশন থেকে তোমাকে তুলে নেবো। এক দুইদিন পর হয়তোবা একা একা যেতে পারবে।

থিয়েটার হলের ভেতর ঢোকার পর দেখলাম ব্রিটিশ ছাত্রদের পাশাপাশি পাঞ্জাব, দিল্লি, হায়দারাবাদ, ঢাকার অনেক ছেলেমেয়ে। একে একে সবাই আমার সাথে হাত মিলিয়ে নিজের পরিচয় দিলো। আমিও আমার পরিচয় দিলাম। প্রথম দিন প্রিন্সিপাল স্যার স্টিফেন স্মিথ কলেজের ইতিহাস বর্ণনা করলেন। কলেজ থেকে কারা কারা চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসাধারণ অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সেই কথা বললেন। এরপর আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, নিশ্চয় তোমাদের মাঝে এমন অনেক প্রতিভা রয়েছে। যে এ ধরনের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। স্যারের ইংরেজি শব্দ বুঝতে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিলো। পরের দিকে একটু মনোযোগী হওয়ার পর দেখলাম, তিনি বেশ সাবলীল ইংরেজি এবং প্রচলিত ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন।

থিয়েটার হলের পাশে বিশাল লাইব্রেরি। ক্লাস শেষ করে সবাই লাইব্রেরিতে গেলাম। পছন্দমত বই নিয়ে পড়লাম। লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে বসে নটিংহিল স্টেশনে দাঁড়ালাম। একটু পর দাদা বাবু আমাকে গাড়িতে তুলে নিলেন। গাড়িতে আমরা নটিংহিলের বাড়িতে ফিরলাম। বাড়িতে ফিরে চা নাস্তা করার পর মনে হলো সুস্মিতাকে একটা চিঠি লেখা প্রয়োজন। ও নিশ্চয় আমার কথা ভাবছে। দাদাকে বললাম, দাদাবাবু আমি বাড়িতে একটা চিঠি লিখব। উপরে যাচ্ছি। দাদাবাবু আচ্ছা বললেন।

কাগজ কলম নিয়ে বসে ভাবছি কি লিখব? তারপর ভাবলাম যেটাই মনে আসে লিখে ফেলবো। এই ভাবনাকে উপজীব্য করে লেখা শুরু করলাম।

প্রিয় সুস্মিতা,

সুজনপুর। যে গ্রামে তুমি এবং আমি জন্মগ্রহণ করেছি। তোমার দিকটা আমি বলতে পারবো না। তবে, আমাকে গ্রামটি আলো ছায়া বাতাস দিয়ে সব সময় ভরিয়ে রেখেছিলো। আমার ধরিত্রীর ন্যায় মাতা কখনই তার স্নেহ থেকে আমাকে আলাদা করতে চাননি। বাবজান নিজের চেষ্টায় পড়ালেখা করে তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য জমিদার বাবুর আগ্রহে তোমাদের বাড়িতে কাজ করতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন ইউরোপের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ না করে সামনে এগুতে পারবো না। সেই চিন্তায় আমার কলকাতায় আসা এবং তোমার সান্নিধ্য লাভ। তুমি শুধু অপরূপ সুন্দর একজন মানুষ তাই না। তুমি অনুপ্রেরণার উৎস। তোমার মাঝে এমন কিছু আছে কেউ তোমাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। আমিও পারিনি। কলকাতা থেকে বিলাত আসার সময় যতই কাছে আসছিলো, আমি ততই আমার স্বকীয়তা হারাতে বসেছিলাম। তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তোমার মাঝে অনেক ছেলেমানুষি রয়েছে। কিন্তু আমি তো পরিণত মানুষ। তোমার আর আমার মাঝের ব্যবধান আমি জানি। তবে কি আমিও তোমার মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি? এ

দায়ভার আমি আসলে কাকে দেবো? শুরুতে যেটা বলেছি, তোমাকে এড়িয়ে যাবার সাধ্য কারো নাই। নিকট অতীতে আমাদের মাঝে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার দায়ভার শুধুই আমার। এ নিয়ে তুমি কখনও নিজেকে দোষী করবে না। আমি তোমার আনন্দ বেদনা, দুঃখ কষ্ট, হাসি-কান্না একাই বয়ে বেড়াতে প্রস্তুত। আমার জীবনে যে রকম দুর্যোগ আসুক সব দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য আমি নিজেকে প্রস্তুত রেখেছি। বিলাতে আমার শরীর পড়ে থাকে। আমার হৃদয় পড়ে থাকে পার্কস্টিটের দোতলায় সেই কক্ষে। যেখানে তুমি আরাম কেদারায় বসে চোখ বন্ধ করে অযুত নিযুত লক্ষ কোটি কি যেন ভাবো। আমি হয়তো সহসাই আসতে পারবো না। কিন্তু চাইলেই তুমি আসতে পারো। যতদূর ধারণা তোমার এফ.এ. ক্লাসের পরীক্ষা খুব একটা দূরে নাই। তুমি আসলে আমাদের সামনের দিনগুলোকে আমি রঙিন কাগজের মলাট দিয়ে সাজাবো।

চেষ্টা করবে ভালো থাকতে। তুমি ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকবো।

ইতি
হয়তো কাছের হয়তো দূরের
আবু বকর।

পরের দিন কলেজের পাশে পোস্ট অফিসে যেয়ে চিঠিটি পোস্ট করলাম। কলকাতায় চিঠি পৌঁছতে কত সময় লাগে আমার জানা নাই। তবে পৌঁছাবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

আজও দাদা বাবু আমাকে নটিংহিল স্টেশনে নামিয়ে দিলেন। আমি বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, এমন সময় আমার সহপাঠী ক্রিস্টিনা আমাকে ডেকে ওর ট্যাক্সিতে তুলে নিলো। ক্রিস্টিনা এত দ্রুত ইংরেজি বলে আমি ওর সব কথা ধরতে পারি না। শুধু বুঝলাম ও বলতে চাইছে ওর বাসাও নটিংহিলে। চাইলে আমি ওর সাথেই ওর গাড়িতে যাতায়াত করতে পারি। আমি ক্রিস্টিনাকে বললাম, যদি দরকার পরে তোমার সাহায্য নেবো। এই বলে ক্লাসে চলে গেলাম। ক্লাস শেষে লাইব্রেরি ওয়ার্ক করে হিলিংটন বাসস্ট্যান্ড হয়ে বাসায় একাই চলে আসলাম। দাদাবাবু এসে বললেন, কীভাবে এলে? আমি বললাম, কানেকটিং বাস ধরে এসেছি। খুব সহজ পথ, আজ থেকে একাই যাতায়াত করতে পারবো। দাদা বাবু বললেন, Very good. নটিংহিলের বাসায় বসে আজকাল আমায় ভাবনায় জেকে বসেছে, সুস্মিতা পার্কস্টিটের বাড়িতে একা একা কি করছে? আমি আমার পড়ালেখা সঠিকভাবে করতে পারছি কি?

এ ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা নাই। শুরুতে কলেজের স্যারদের কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিলো। এখন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। মিথস্ক্রিয়া কোনো ধরনের সমস্যা হয় না। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলোতে আমার কর্ম দক্ষতা ও আগ্রহ দেখে স্যাররা আজকাল আমাকে পছন্দ করতে শুরু করেছেন।

ইদানীং ক্রিস্টিনা প্রতিদিন নটিংহিল থেকে আমাকে তুলে নিয়ে যায়। বারবার নিষেধ করলেও শোনে না। যতবার বলি আমি একা যেতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। ওর বক্তব্য পরিষ্কার, আমাকে তো যেতেই হয়। তুমি গেলে অসুবিধা কোথায়? সত্যি বলতে, ক্রিস্টিনা সারাক্ষণ এত কথা বলে, আর এত তাড়াতাড়ি কথা বলে ওকে মাঝে মাঝে বুঝতে পারি না। ক্রিস্টিনা সুযোগ পেলেই ওর পরিবারের কথা বলে। বাবা মা আর তিন বোনের সংসার। বাবা উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা। মা নানা রকম পার্টি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ছোট দুই বোন। জুলিয়া হায়ার স্কুল সার্টিফিকেট শেষ করেছে। টিউলিপ জুনিয়র সার্টিফিকেট শেষ করেছে। ক্রিস্টিনা একজন বন্ধুকে নিয়ে সারাজীবন কাটাবে এমন কোনো নিয়ম বিধি মানতে রাজি না। আজ একজন কাল একজন বন্ধুর সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করে। কোনো বন্ধু বারে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেই বিনা বাক্য ব্যয়ে তার সাথে চলে যাবে। বাড়ি ফিরতে দেরি করলে বাবা কিংবা মার কাছে কোন কৈফিয়ত দিতে হয় না। যেটা করতে চাইবে সেটাই করতে পারে।

ক্রিস্টিনা আজকাল আমার ওপর বেশি বেশি ছড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করে আমি খুব সাবধানে ক্রিস্টিনার আবদারগুলোকে এড়িয়ে যাই। ক্রিস্টিনার গাড়িতে আজও ফিরলাম। দীর্ঘদিন একসাথে চলতে চলতে ক্রিস্টিনাও আজকাল বুঝতে পারে আমার পছন্দ অপছন্দ খুব একটা বিরক্ত করে না। নটিংহিলের বাসায় ফিরে ঘরে ঢোকার পর পোস্ট বক্সে একটা চিঠি পেলাম। নীল খাম। খামের ওপরে লেখা Mr. Abu Bakkar. চিঠিটা নিয়ে সোজা দোতলায় আমার ঘরে চলে এলাম। ততক্ষণে আমার বুকটা ধড়ফড় করে উঠলো। নিজের অজান্তেই শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হতে শুরু করলো। চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করলাম। চিঠিটা খুলে পুরো চিঠিটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। ততক্ষণে আমার চোখ ঝাপসা হতে শুরু করেছে। নিজেকে সংযত করে পড়তে শুরু করলাম।

প্রিয় আবু বকর,

ইদানীং কলকাতার শহরকে আমার খুব অপরিচিত মনে হয়। মনে হয় কোনো এক অজানা দ্বীপে আমি নির্বাসিত। এর মাঝেই আমার এফ.এ. ক্লাস পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সামনের সপ্তাহে রেজাল্ট। ভালো করবো কি না জানি না। আজকাল খুব

অসহায় বোধ করি। সারাজীবন নিজের পছন্দ অপছন্দ মত কোনো কিছু করতে পারি নাই।

বাবা, কাকাবাবু, কাকিমা কোনোদিন ভাবে নাই আমি কি চাই? কীসে আমার ভালো লাগা? সবার সিদ্ধান্ত আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। আমি অতৃপ্ত মানুষ হিসেবে তিলতিল করে বেড়ে উঠেছি।

আজকাল সমস্ত শাসন ভেঙে ফেলার স্বপ্ন দেখি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি সেটাই করবো যেটা আমার ভালো লাগে। আশা করি আমার এই স্বপ্ন পূরণে তুমি আমার পাশে থাকবে। আমার পথ চলার সাথী হবে। আমাদের এক সাথে চলার সময় খুব বেশি দূরে নাই। তুমি ভালো থেকো।

তোমার
সুস্মিতা

চিঠিটা আমি ৫ বার পড়লাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম সুস্মিতাকে আমি কারো সিদ্ধান্তের পরিণতি হতে দেবো না। ও যা করতে চাইবে আমি ওর পাশে থাকবো। যত বড় সাইক্লোন আসুক আমি সামনাসামনি দাঁড়াবো। আজকাল সময় খুব একটা যেতে চায় না। ক্লাস শেষে মাঝে মাঝে লন্ডন ব্রিজ, ওয়াটার লু বাকিংহাম প্যালেস, সাউথ পোর্ট, লিলিংটন স্টেশন, কেমাডল টাউন, হেমস্ট্রিট, ব্রিস্টল, কিং ক্রস স্টেশনে সন্ধ্যা অবধি বসে থাকি।

থোকায় থোকায় জমে যাওয়া বরফ দেখি। মাঝে মাঝে বরফ কাটার গাড়ি বরফ কেটে রাস্তা পরিষ্কার করে চলে যায়। আবার বরফে ঢেকে যায়। তবুও বরফ ঢাকা শহরে কর্মব্যস্ততার কমতি নাই। সবাই সারাক্ষণ ছুটতে থাকে। প্রত্যেকটি বৃটিশ নাগরিকের মধ্যে একজনের চেয়ে আর একজনের বড় হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। একজনকে পেছনে ফেলে আর একজনের এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। এরা কখনই ভাবে না সব কিছু ফেলে একদিন চলে যেতে হবে কোনো এক অজানায়। এর মধ্যে পাশের গির্জা থেকে ঢংঢং ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠলো। প্রচণ্ড এই ঠাণ্ডার মধ্যেই এখানকার মেয়েরা সটস আর মোজা পরে ঘুরে বেড়ায়। ছেলেরা অধিকাংশ কোর্ট, প্যান্ট, জ্যাকেট, ওভার কোর্ট, হাতমোজা, মাংকি ক্যাপ পরে রাস্তায় নামে। মাঝে মাঝে ভাবি এখানকার মেয়েদের কি ঠাণ্ডা লাগে না। দুএকজন ছাড়া প্রায় সকলের গাড়ি আছে। যাদের গাড়ি নাই তারা পাবলিক বাসে যাতায়াত করে আমার মত। অনেকক্ষণ পর মনে হলো বাসায় ফেরা দরকার। বাস স্টেশনে যেয়ে বাস ধরলাম। বাসায় এসে দেখি দাদাবাবু চলে এসেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, দেরী যে?

আমি বললাম, লন্ডন শহরকে আজ একটু ঘুরে দেখলাম। দাদাবাবু বললেন, শীতের কাপড়তো সে রকম পর নাই ঠাণ্ডা লাগতে পারে। যা হোক, ফ্রেস হয়ে এসো স্যুপ বানিয়েছি।

স্যুপ খেতে খেতে দাদা বাবু বললেন, তোমার প্রিন্সিপালের সাথে আমি কথা বলেছি। তোমার কথা জিজ্ঞেস করতেই বললেন, I have no complain about Abu Bakkar. He is doing excelent Job.

আমারও ধারণা তুমি ভালো করবে। পাস করে তুমি কোথায় চাকরি করতে চাও? আমি বললাম, আমি সুজনপুর হাসপাতালে যোগ দিবো। আমার মা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। সুজনপুরের মানুষ আজও চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত। দাদাবাবু বললেন, আমার বাবা জমিদার বাবুও চান তুমি সুজনপুরের তার দাতব্য চিকিৎসালয়ে কাজ করো। আমি বললাম, শুধু এমবিবিএস নয় এফসিপিএস করেই বিলাত থেকে যাবো। আমি দাদাবাবুর কথায় সায় দিয়ে বললাম, আমি এফআরসিপিএস করেই ফিরবো।

লন্ডনে এবারের গ্রীষ্মটা পত্র পল্লব আর ফুলে ফুলে ভরা। সূর্যের প্রখরতা না থাকলেও ফুলে ফুলে ভরে গেছে পুরো শহর। গাছে গাছে নতুন পাতা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হানা দেয়। এই শহরের মানুষগুলো গ্রীষ্ম খুব একটা পছন্দ করে না বলেই মনে হয়। কলকাতা, দিল্লি, বাংলা, পাঞ্জাবের ছেলে-মেয়েরা গ্রীষ্মটার জন্য অপেক্ষা করে। কফিশপে ক্যান্টিনে জমিয়ে আড্ডা মারে। আমি আমার আর্থিক সঙ্গতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। চেষ্টা করি এইসব আড্ডা এড়িয়ে চলতে। কলেজ লাইব্রেরিতে বসে যে নোট সংগ্রহ করি বাসায় বসে সেগুলো চর্চা করি।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠার পর দাদাবাবু বললেন, কাল সুস্মিতা আসবে। স্কুল অব মেডিসিন ফর উইমেনে ওর ভর্তির ব্যবস্থা করেছি। কাল সকাল ১০টায় হিত্রো বিমান বন্দরে ও ল্যান্ড করবে। এরপর দাদাবাবু বললেন, তুমি কি সুস্মিতাকে বিমান বন্দর থেকে বাসায় নিয়ে আসতে পারবে? কাল কোর্টে আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ কেস ট্রায়াল করতে হবে। আমি বললাম, দাদাবাবু সুস্মিতাকে আমিই নিয়ে আসবো। আপনি চিন্তা করবেন না। আমার অতি আগ্রহ দাদাবাবুর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি বললেন, আমি জানি তুমিই যাবে।

আজ লন্ডনের মিষ্টি রোদ পুরো শহরকে সোনালি আভায় ভরিয়ে দিয়েছে। পত্র পল্লব আর ফুলগুলো নতুন পরশ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমি তৈরি হয়ে বসে ছিলাম। দাদাবাবু আমাকে নিয়ে বাসা থেকে বের হলেন। আমাকে হিত্রো বিমান বন্দরের পার্কিং এরিয়ায় রেখে দাদাবাবু চলে গেলেন। আমি রিসিপশন লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। আমার হার্টবিট ৮০ থেকে বেড়ে ১২০ এ পৌঁছে গেছে এর মধ্যে সুস্মিতা একটা হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে, পরনে সেলোয়ার কামিজ। সুস্মিতাকে দেখে আমার চোখ থেকে টপটপ করে পানি ঝরতে শুরু করলো। আমি পুরোটাই ঝাপসা দেখলাম। আমার কাছাকাছি আসার পর কেন জানি সুস্মিতা কোন কথা বলতে পারলো না। শুধু একবার বলল, আছো কেমন?

ওর চোখ দিয়েও এক ফোঁটা পানি পড়লো। কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর বলল, বেঁচে থাকার জন্য সাত সাগর তেরো নদী পার হওয়ার দরকার ছিলো না। যারা খুব অল্পতে জীবন ধারণ করতে পারে, তারাই ভালো থাকে। পরিমিত খাবার, সামান্য পোশাক সুখি হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমি সুস্মিতার কথায় কোনো উত্তর দিলাম না। দীর্ঘ ভ্রমণে ওর চোখ মুখে ক্লান্তির ছায়া। ওর ব্যাগটা নিয়ে বললাম, চলো বাসায় যাই, বাসায় যেয়ে এরপর তোমার সব কথা শুনবো। বিমান বন্দরের বাইরে এসে আমি একটা ট্যাক্সি নিলাম। ভিক্টোরিয়া, সেপলার্ড ইউশোন, কিংক্রস, ওয়াটার লু, লন্ডন ব্রিজ বাকিংহাম প্যালেসের পাশ দিয়ে আমরা ছুটতে ছুটতে নটিংহিল পৌঁছে গেলাম। ট্যাক্সিতে সুস্মিতা আর কোনো কথা বললো না। চোখ বন্ধ করে শুধু আমার গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রইলো।

লন্ডনের মেডিকেল কলেজগুলোতে শীতে একবার এবং গ্রীষ্মে একবার ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়।

সুস্মিতা গ্রীষ্মের সিজন ধরতে পারায় শীতের ভয়াবহতা খুব একটা অনুভব করতে পারেনি। নটিংহিলের বাসায় যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় দুপুর। আমি সুস্মিতার জিনিসপত্র বাসার ভেতরে নেয়ার পর ওকে সোফায় আরাম করে বসিয়ে দিয়ে বললাম, আজকাল আমি অনেককিছু রান্না করতে পারি। সুস্মিতাকে বসিয়ে রেখে আমি ওর জন্য স্যুপ তৈরি করে আনলাম। স্যুপ খেতে খেতে সুস্মিতা বলল, কাকিমা আসার সময় বলেছিলেন, কলকাতা, দিল্লিতে ভালো মেডিকেল কলেজ আছে, আমি সেখানে ভর্তি হচ্ছি না কেন? আমি এর কোনো উত্তর দেইনি। শুধু বলেছিলাম, আমি বিলাতেই পড়বো। কাকিমা শুনে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার কি আবু বকরকে ভালো লাগে? আমি এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেইনি। কাকিমা শুধু বলেছিলেন, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এখনও সেই রকম উদার হতে পারেনি। যে সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ব্যবধান সর্বাধিক বিবেচনার মধ্যে পড়ে। পড়ে না শুধু বর্তমান। তোমার ভেতরে ভালোবাসার যে কলির জন্ম নিয়েছে। সেটাকে আর প্রস্ফুটিত হতে দিও না। সামাজিক আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা করে তুমি হয়তো পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারবে। ভেবে দেখো তোমাদের কল্যাণে মেধাবী ছেলেটা আগামী দিনের নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে তার জীবনে নেমে আসবে অমাবশ্যার ঘোর অন্ধকার। তোমার বাবা, কাকাবাবু, দাদার অর্থবিত্ত, সামাজিক অবস্থা নিমিষেই আবু বকরের জীবনকে তছনছ করে দেবে।

শুনে আমি সুস্মিতাকে বললাম, কাকিমার আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিও না। মানুষ নানা চড়াই উতরাই পার করে জীবনের সঠিক পরিণতি বিবেচনা করতে পারে। কাকিমার এ ভাবনা নিছক ভাবনা নয়। নির্ঘাত পরিণতির কথাই তিনি বলেছেন।

শুনে সুস্মিতা বলল, সবার ইচ্ছার মূল্যায়ন করতে করতে আমি পরিশ্রান্ত। এখন আমি শুধু আমাকে নিয়ে ভাববো, যা ভালো লাগে সেটাই করবো। আমি সুস্মিতার

কথায় অন্যরকম একটা জোর অনুভব করলাম। আমি ওর যুক্তিহীন আবেগকে প্রতিহত করার চেষ্টা করলাম না।

বিকেলে দাদা বাবু কোর্ট থেকে ফিরে এলেন, অতি আদরের ছোট বোনকে জড়িয়ে ধরে ওর কপালে একটা স্নেহের চুম্বন দিলেন। তারপর বাবা-মা কাকাবাবু কাকিমার কথা একে একে জিজ্ঞেস করলেন। সুস্মিতা একে একে সবার কথা বললো। সবার কথা শোনায় বললেন, তোমার ভর্তির সব কাজ শেষ। সামনের সপ্তাহ থেকে ক্লাস শুরু। মেডিকেল কলেজটি পুরোপুরি রেসিডেন্সিয়াল। ওখানে থেকেই পড়ালেখা করতে হবে। রোববার কলেজ বন্ধ থাকে। তুমি শনিবার ক্লাস সেরে এখানে এসে থাকতে পারবে।

এরপর দাদাবাবু বললেন, অনেক বড় রাস্তা পার হয়ে এসেছো। নিশ্চয় ভাত খেতে ইচ্ছে করছে। চিকেন ফ্রাই আর ভাত কেমন হয়। সুস্মিতা বলল, দাদা তোমার যেটা ভালো লাগে সেটাই করো। আমার কোনো কিছুতেই আপত্তি নাই। রান্নার পর আমরা খেতে বললাম। খেতে খেতে দাদাবাবু বললেন, এক সপ্তাহ পর ক্লাস শুরু, একটাদিন আবু বকরের দায়িত্ব সুস্মিতাকে লন্ডন শহর ঘুরিয়ে দেখানো।

রাতে ঘুমানোর জন্য সুস্মিতার ব্যাগ দোতলার ঘরে রেখে আমার জিনিসপত্র নিচতলায় গেস্টরুমে নিয়ে এলাম।

আজ কেন জানি সারারাত ঘুমাতে পারলাম না। লন্ডনের দুইটা জিনিস কখনও ঘুমায় না। একটা বিগবেল অপরটা গীর্জার ঘণ্টা, আজ এর সাথে যোগ হলো আবুবকর। নটিংহিল আবাসিক এলাকায় গভীর রাতে খুব একটা লোকজনের আনাগোনা নাই। গ্রীষ্মের এ সময়ে মাঝে মাঝে বার কিংবা ক্যাবারে থেকে উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের প্রচণ্ড হর্ন বাজিয়ে ছুটে যেতে দেখা যায়। এর আগে এ ধরনের দৃশ্য আমার নজরে খুব একটা পড়ে নাই।

সুস্মিতা ঘুম থেকে জাগার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঘুম কেমন হয়েছে? উত্তরে বললো, অনেকদিন পর আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পেরেছি। কোনো দুশ্চিন্তা আমাকে বাঁধতে পারেনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আজ কোথায় যাবে? সুস্মিতা বলল, কলকাতায় আসার পর আমি তোমাকে কলকাতা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলাম, লন্ডন ঘুরিয়ে দেখানোর দায়িত্ব তোমার, কোথায় নেবে এ সিদ্ধান্তও তোমার। দাদা বাবু বের হওয়ার পর আমরা বের হলাম। প্রথমে গেলাম ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। সুস্মিতাকে বললাম, কলেজ থেকে একবার স্টাডি ট্যুরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এসেছিলাম। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে সারা বিশ্বের তাবৎ ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক সম্পদ ওরা সংগ্রহ করে এখানে নিয়ে এসেছে। মিশরের পিরামিড থেকে ফারাও রাজাদের মমি, ভারতীয় দেব-দেবীদের মূর্তি, হিরে জহরত, এমনকি ঢাকাই মসলিনও পাবে এই জাদুঘরে। ঘুরতে ঘুরতে সুস্মিতা বলল, কোহিনূরসহ ভারতীয় যে সকল সম্পদ ব্রিটিশরা তুলে এনেছে আমরা যদি ফেরত চাই ওরা কি দেবে? আমাদেরও মিউজিয়াম আছে। সুস্মিতার প্রশ্ন শুনে বললাম, ভারত কিংবা অন্য দেশে

প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ কিংবা প্রদর্শনের সংস্কৃতি ব্রিটিশদের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে। যদিও মিউজিয়াম কালচার সর্বপ্রথম মিশরীয়দের মাধ্যমে শুরু হয়েছিলো। সারা পৃথিবীর মানুষ বেড়াতে আসে এই মিউজিয়ামে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামকে বলা হয় মিউজিয়ামের জনক। ওর নিদর্শন পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই করুক ফেরৎ দেবে না। এরপর সুস্মিতা বলল, আমরা যদি আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করি? উত্তরে বললাম, ভারত শাসন করে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। যে কোম্পানির প্রতি ব্রিটিশ রাজ পরিবারে রয়েছে সমর্থন। সুস্মিতা আমার কথায় সায় দিলো। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ৭০ লক্ষ নিদর্শন ওপেন লাইব্রেরি দেখতে দেখতে আমরা সারাটাদিন পার করলাম। মাঝে একবার সুস্মিতাকে বলেছিলাম, তোমার ক্ষুধা লেগেছে? সুস্মিতা বলল, তুমি পাশে থাকলে আমার ক্ষুধা লাগে না। মনে হয় হৃদয় পূর্ণ থাকলে জঠর খালি হওয়ার বিষয়টি টের পাই না। তবুও সুস্মিতাকে বললাম, মানুষের হৃদয় এক অদ্ভুত জিনিসে তৈরী। কখন তার কি ভালো লাগে সে বুঝতে পারে না। তাদের জীবনে কোনো কষ্ট নাই। তারা ভাবে কষ্ট পাওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অপার আনন্দ। আর যারা কষ্টে থাকে দিনশেষে একটু আনন্দ পাওয়ার জন্য কতই না কষ্ট করে।

নটিংহিলের বাসায় ফিরে সুস্মিতা কাকিমা, কাকাবাবু, বাবা, মা সবার কাছে আলাদা আলাদা করে চিঠি লিখলো। চিঠির বক্তব্য সব প্রায় একরকম।

আমি ঠিকমত বিলাতে পৌঁছেছি।

দাদার বাসায় উঠেছি। বাসাটা খুব সুন্দর। তোমরা ভালো থেকো।

দাদা কোর্ট থেকে ফিরে সুস্মিতাকে বলল, তোমার কেমন লাগছে? সুস্মিতা বলল, খুব ভালো। এরপর বলল, ব্রিটিশরা খুবই সন্দেহপ্রবণ জাতি। ওরা পৃথিবীর কাউকে বিশ্বাস করে না। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবে না। সুস্মিতা আচ্ছা বলে দাদাবাবুর কথায় সায় দিলো।

পরেরদিন সুস্মিতাকে নিয়ে গেলাম ভিক্টোরিয়া ও আলভার্ট মিউজিয়াম এবং ওয়ার মিউজিয়ামে। সুস্মিতা মিউজিয়াম দেখতে দেখতে বলল, ১৭৫৭ সালে পলাশিতে যে যুদ্ধ হয়েছিলো স্বল্প সংখ্যক ভাড়াটিয়া সৈন্য ছিল ইংরেজ সেনাদক্ষ লর্ড ক্লাইভের সাথে। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সাথে ছিলো বিশাল সৈন্য বাহিনী। তবুও পরাজয়।

আমি বললাম, মীর জাফর আলী খানের ইংরেজ আঁতাত এবং জগৎশেঠের ষড়যন্ত্র এ পরাজয়ের জন্য দায়ী। আজ ভারতীয়রা যে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ এ বিষয়টি আঁচ করতে পারলে ঐ অঞ্চলের লোকজন একত্র হয়ে ইংরেজদের ওপর শুধু যদি পাথর নিক্ষেপ করতো তবে ইংরেজ সৈন্যরা ভাগিরথী নদীতে সাঁতার কেটে পালিয়ে যেতো। কিন্তু ইংরেজদের কৌশলের সাথে ভারতীয়রা পেরে উঠেনি। এজন্য আজ আমরা ইংরেজ শাসনের বেড়াজালে বন্দি। শুধু আমরা না পৃথিবীর অর্ধেক ব্রিটিশ শাসনের কাছে বন্দি। এরপর জুয়েলারি গ্যালারিতে যেয়ে সুস্মিতার

চোখ একেবারে ছানাবড়া। রানীর মাথার তাজ দামী দামী মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরি। নীলা, গোমেজ, আকিক ডায়মন্ড কি নাই সেই তাজে। ব্রিটিশ বণিকরা সারা পৃথিবী ঘুরেছে আর মূল্যবান সব সামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে লন্ডনে। নিজেদের আভিজাত্য প্রকাশ করতে দৈনন্দিন জীবনের নানা আয়োজনে ব্যবহার করেছে সেই সব মূল্যবান সম্পদ।

সুস্মিতাকে বললাম, যেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কেউ কোনোদিন দাঁড়াতে পারেনি। আজ জার্মান বাহিনী সারা বিশ্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে। জার্মানিরা বলতে চাইছে ওরাই পৃথিবীর সেরা জাতি, ওদের শরীরে আছে নীল রক্ত। বিশ্বকে শাসন করার অধিকার একমাত্র ওদের আছে। ব্রিটিশরা ভারতীয়দের যুদ্ধে সম্পৃক্ত করতে গঠন করেছে War Council. জিন্নাহসহ অনেক ভারতীয় নেতা War Council -এ সম্পৃক্ত হচ্ছে না। বিশ্বযুদ্ধের এ সময়ে মোহন লাল করমচাঁদ গান্ধী 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করেছে মুসলিম লীগ নেতারা মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার ঘোষণা করেছে। ব্রিটিশ ভারত ছাড়লেও ভারতের একক রাষ্ট্র থাকার সম্ভাবনা একেবারেই সীমিত হয়ে পড়েছে। লন্ডনের সব প্রভাবশালী পত্রিকায় ভারতের হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার খবর বের হচ্ছে। মনে হচ্ছে ইংরেজ ভারত ছাড়লেও ভারতকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করবে।

পরের দিন লন্ডন ব্রিজ, বাকিংহাম প্যালেস, ভিক্টোরিয়া স্টেশন, চিড়িয়াখানা, ওয়াটার লু, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, কিংক্রস স্টেশন দেখতে দেখতে মনে হলো চোখের পলকে সপ্তাহটা পার হয়ে গেলো। শনিবার সন্ধ্যায় দাদা বাবু সুস্মিতাকে ওর লেডিস হোস্টেলে রেখে আসতে বলল, আমি ওকে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে বললাম, শনিবার আমি তোমাকে বিকেলে নিতে আসবো। তুমি গেটে অপেক্ষা করবে।

শনিবার থেকে শনিবার পুরোটা সপ্তাহ আমার কাছে বোঝার মত মনে হচ্ছে। তবুও পুরো সপ্তাহ অপেক্ষার পর শনিবার সুস্মিতা আর আমার দেখা হয়। যেদিন দেখা হয় আমার হৃদয়ে বয়ে যায় শীতল পরশ। আজকাল সুস্মিতার আচরণেও পরিবর্তন এসেছে। বাসায় এসে সোফায় আমার গা ঘেঁষে বসে। ভারি খাবার খেতে চাইলে শাসন করে, রাত বেশি জাগলে নানা সমস্যার কথা বলে, মাঝে মাঝে সুস্মিতা ভুলে যায় আমি ডাক্তারি বিদ্যা পড়ালেখা করছি। এভাবেই আমাদের দিনগুলো বেশ ভালোই কাটছিলো। এর মধ্যে আমার এমবিবিএস পরীক্ষা শেষ হয়েছে। রেজাল্ট বেশ ভালো। ইনটার্ন করার সময় যে ক'জন এফসিপিএস করার জন্য কলেজ নির্বাচন করেছে তাদের মধ্যে আমার নামও রয়েছে। সুস্মিতাকে আমার এমবিবিএস রেজাল্ট জানালাম। সুস্মিতা শুনে বলল, তোমার এমবিবিএস-এর অনুপ্রেরণা যেমন সুজনপুর গ্রাম। তেমনি সুজনপুরের সুস্মিতা নামের একটি মেয়ে দিনের পর দিন তোমার প্রতীক্ষায় দিন কাটায়। আমি সুস্মিতার কথায় একটা যুদ্ধ যুদ্ধ প্রস্তুতির আভাস লক্ষ্য করলাম। সুস্মিতার মনের জোর অনেক বেশি। কিন্তু আমি কি সুস্মিতার মত এই সমাজ, সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমার হৃদয়ের

ইচ্ছার কথাটা বলতে পারবো? তবুও একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমি পালিয়ে যাবো না। এর মধ্যে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ব্রিটিশ আমেরিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ফ্রান্স গঠন করেছে মিত্র বাহিনী। আর জার্মানের হিটলার, ইতালির মুসোলিনী এবং জাপান গঠন করেছে অক্ষ বাহিনী। জার্মান একের পর এক এলাকা দখল করে নিয়েছে। লন্ডন শহরে মাঝেমাঝেই নাৎস্যী বাহিনী বিমান আক্রমণ চালায়। সরকার নাগরিকদের ঘরের বাইরে বের হওয়া নিষেধ করে দিয়েছে। শনিবার আসলেই আমি দাদা বাবুকে সুস্মিতাকে নিয়ে আসার কথা বলি। দাদা বাবু বলেন, ব্রিটিশ সরকার সারা শহরে সৈন্য মোতায়েন করেছে। বেসামরিক লোকজনকে বাইরে বের হতে নিষেধ করেছে। ইংলিশ চ্যানেলের কারণে নাৎসী বাহিনী বৃটেনে প্রবেশ করতে পারবে না। মিত্র বাহিনীর কাছে নাৎসী বাহিনী বৃটেনে প্রবেশ করতে পারবে না। মিত্র বাহিনীর কাছে নাৎসী বাহিনী দ্রুতই পরাজিত হবে। এর মধ্যে জাপানি সৈন্যরা বার্মা দখল করেছে। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের কৌশলে War Council- এ সম্পৃক্ত করে যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে।

সমস্ত জল্পনা কল্পনা ছাপিয়ে আমেরিকা পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার করে জাপানের হিরোসিমা আর নাগাসাকিতে নিক্ষেপ করেছে। বোমার ভয়াবহতা পুরো যুদ্ধের প্রক্রিয়াকে পাল্টে দেয়। নাৎসী বাহিনী মিত্র বাহিনীর কাছে পরাজয় বরণ করে। জার্মানের অবিসংবাদিত নেতা হিটলার আত্মহত্যা করেছে বলে খবর বের হয়। যুদ্ধের ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠতে ব্রিটিশ সরকার স্বল্প মেয়াদী মধ্যবর্তী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বেসামরিক জনগণের ওপর নিষেধাজ্ঞা সীমিত করায় দাদা বাবু একদিন সুস্মিতাকে বাসায় নিয়ে এলেন। সুস্মিতা আমাকে বলল, একবার আমাকে তো দেখতে যেতে পারতে। আমি বললাম, আমি যেতে চেয়েছি কিন্তু দাদাবাবু আমাকে বাইরে বের হতে দেন নাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হোস্টেলের দিনগুলো তোমার কেমন করে কাটতো? সুস্মিতা বলল, যুদ্ধ বিমান যখন ঝাঁকে ঝাঁকে লন্ডনের আকাশে উড়ে আমরা দ্রুত জানালার পাশে চলে যাই। সেকেন্ডের মধ্যেই বিমান চোখের আড়ালে চলে যায়। যখন সৈন্যরা সাইরেন বাজায় তখনও জানালার পাশে যেয়ে বসি। কিছুই আর দেখি না। যে সমস্ত স্থানীয় মেয়েরা আমার সাথে পড়ে তাদের অভিভাবকরা অনেক আগেই তাদের নিয়ে গেছে। লন্ডনের বাইরের শহর থেকে যারা এসেছে কিংবা আমাদের মত অন্যদেশ থেকে যারা এসেছে তারাই হোস্টেলে আছে। এদের সংখ্যা খুব একটা বেশি না।

মাঝে মাঝেই মনে হতো জার্মান বাহিনী হোস্টেলের ছাদের উপর বোমা মারবে। বোমার আঘাতে আমি মারা যাবো। আর তুমি আমাকে দেখতে আসবে। এ ভেবেই মনে হতো, মরে গেলেও তুমি তো আমাকে দেখতে আসবে, এই স্বপ্নেই আমি মাঝেমাঝেই মরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু দেখি আমি আজও বেঁচে আছি। বসে আছি ঠিক তোমার সামনে। সুস্মিতাকে বললাম, তুমি আমার জীবনের অক্সিজেন। তোমার অবর্তমানে আমি কীভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করবো? তুমি

বেঁচে থাকো যুগ যুগ। রাতে খাওয়ার পর সুস্মিতাকে দোতলার ঘরে ঘুমিয়ে পড়তে বললাম।

সকালে ঘুম থেকে জেগেই দাদা বাবু বললেন, আবু বকর কাল বাবার একটা চিঠি পেয়েছি। তিনি লিখেছেন তোমার বাবজান খুব অসুস্থ। তোমাকে দ্রুত সুজনপুর যেতে হবে। বাবজানের কথা মনে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে গেলো। কতটা বছর বাবজানের সাথে দেখা নাই। দাদাবাবুকে বললাম, আমি কালই রওনা হবো। দাদা বাবু বিমানের টিকেট কেটে আনলেন। সরকারি দফতরের অনুমতি আনলেন একদিনের মধ্যেই।

সব প্রক্রিয়া যখন শেষ সুস্মিতা বলল, আমি এলাম আর তুমি চলে যাবে? বললাম, বাবজানের আমি ছাড়া আর কেউ নাই আমার যাওয়া খুব জরুরী। সুস্মিতা বলল, যেতে পারো তবে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। আমি আচ্ছা বললাম। পরের দিন সকালে সুস্মিতা আমাকে হিত্রো বিমান বন্দরে পৌঁছে দিয়ে বলল, মনে রাখবে শুধু তোমার জন্য আমি সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছি। তুমি না থাকলে আমার অস্তিত্ব আমি টের পাই না। মনে হয় শূন্য প্রান্তরে আমি একাকী এক পথচারী।

আমি বললাম, আমার সমস্ত অনুভূতির মাঝেই তুমি। তুমি বিহীন আমার অনুভূতি প্রাণহীন এক দেহের মত। ইমিগ্রেশনে ঢোকার সময় সুস্মিতাকে বললাম, আমি আসি। সুস্মিতা একটি কথাও বললো না। এমনিতে ওর চোখ দুটি গভীর। সেই চোখে আজ কাজল পরেছে। চোখের জলে কাজল ছড়িয়ে গেছে চোখের আশেপাশে। সুস্মিতা আমার দিকে তাকাতে পারছে না। আমিও ওর চোখটাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম না।

হিত্রো বিমান বন্দরের মাটি থেকে বিমান এক সময় আকাশে উঠে গেল। শহর, বন্দর, গ্রাম, নদী, সাগর, মহাসাগর পাড়ি দিয়ে বিমানটি তেজগাঁ বিমান বন্দরে ল্যান্ড করলো। বিমান বন্দর থেকে বের হয়ে বাস, ঘোড়ার গাড়ি, নৌকা নিয়ে যখন সুজনপুর গ্রামে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা। পাখিরা কিচিরমিচির শব্দে ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। গাছে গাছে ঝিঁঝি পোকারা একটানা ঝিঁঝিঁ ঝিঁঝিঁ শব্দ করছে।

যখন বাড়ি ফিরলাম দেখলাম বাড়ির টিনের ঘরগুলোর জায়গায় তৈরি হয়েছে পাকা দালান। ঘরে ঢুকে দেখলাম বাবজান একটা আরাম কেদারায় বসে আছেন। আমাকে দেখে বাবজান হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। বাবজানকে বললাম, আপনার শরীর এখন কেমন? বললেন, মাঝে খারাপ হয়েছিলো এখন ভালো। জিজ্ঞেস করলাম এতো কিছু কীভাবে করলেন? বাবজান বললেন, আমি জমিদার কালিচরণ সেন চৌধুরীর সাথে কাজ করি। টিনের ঘরে থাকলে লোকজন বলবে ঠিকমত বেতন পাই না। এজন্য জমিদার বাবুই পাকা দালান করে দিয়েছেন। তিনিই লোকজন লাগিয়ে দালান তৈরি করিয়েছেন।

সকালে ঘুম থেকে জেগে দেখি বাড়ি ভর্তি লোকজন। সকলে বিলাত ফেরত ডাক্তার দেখতে এসেছে। বাবজানের দেখাশুনা খাবারের ব্যবস্থা, জমি চাষাবাদ করার জন্য

বেশ ক'জন লোক বাড়িতে কাজ করে। উৎসুক লোকজন চলে যাওয়ার পর বাবজান আমাকে জমিদার বাবুর বাড়ি নিয়ে গেলেন। জমিদার বাবু তখন কাচারি দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। জমিদার বাবুর গিন্নি আমাকে অন্দর মহলে ডেকে নিয়ে নাড়ু, মোয়া, পায়েস, নানারকম ফল খেতে দিলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন বিলেতে আমার মেয়ে সুস্মিতা আর ছেলে অরবিন্দ কেমন আছে? আমি বললাম, উনারা ভালো আছেন। এরপর বললেন, ওরা কি আমার কথা কিছু বলে? ওরা সারাক্ষণ আপনাকে নিয়ে ভাবেন হয়তো মুখে কিছু বলেন না।

বড় বাবুর তিন তিনটি সন্তান মরে যাওয়ার পর আমরা সুস্মিতাকে উনার কাছে পাঠাই। সুস্মিতাকে আশ্রয় করেই উনারা বেঁচে আছেন। আমরা সুস্মিতাকে না পাঠাতেও পারতাম। আমাদের তো অনেক ছেলে-মেয়ে নাই। নিজের কোল খালি করে আমি আমার সবচেয়ে আদরের সন্তানকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। শুধু মানবিক কারণে। সুস্মিতাকে পাঠিয়ে আমরাও একদণ্ডের জন্য স্বস্তিতে নাই। মেয়েটি আমার বড্ড অভিমানী। খারাপ লাগলেও কোনোদিন কিছু বলবে না।

কাকিমার সাথে কথা বলতে বলতেই বড় বাবু বাড়িতে এলেন। আমাকে দেখেই বড় বাবু বললেন, কি বিলেতি ডাক্তার বাবু কেমন আছো? আমি বললাম, ভালো। তিনি বললেন, নগেন ডাক্তারকে বিদায় করে দিয়েছি। কাল থেকে হাসপাতালে তুমি বসবে। তোমার জন্য চেম্বার সাজাতে বলেছি। অপারেশন থিয়েটারসহ আমার এলাকার চিকিৎসার সকল সুবিধা হাসপাতালে থাকুক এটা আমি চাই।

জমিদার বাবুর প্রস্তাব শুনে বললাম, আমারও ইচ্ছা আপনার হাসপাতালের চিকিৎসার দায়িত্ব নেয়া। কিন্তু আমি এফসিপিএস ভর্তি হয়েছি। মানুষকে সঠিক চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য এফসিপিএস করা খুব প্রয়োজন। বাবু বললেন, তুমি নিশ্চয় ডিগ্রিটা অর্জন করবে। তোমার এই ডিগ্রি নেয়ার জন্য যখন বিলাত যাবে তখন কলকাতা থেকে একজন ডাক্তার নিয়ে আসবো। যেহেতু নগেন ডাক্তারকে বিদায় করে দিয়েছি। সুজনপুরের লোকজন তোমার মার মত যেন বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় এজন্য কিছুদিন তোমার ঐখানে থাকা প্রয়োজন। বড় বাবুকে বললাম, ঠিক আছে আমি কাল থেকে আপনার হাসপাতালে বসবো। যত দ্রুত পারেন একজন বিকল্প ডাক্তার আনার ব্যবস্থা করবেন। এই বলে জমিদার বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাবজানের সাথে বাড়ি চলে এলাম।

সকালে হাসপাতালে যেয়ে দেখি ডাক্তারের চেম্বার সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। ডাক্তারি সরঞ্জাম, অপারেশন সরঞ্জাম আনা হয়েছে। ডিসপেনসারিতে প্রয়োজনীয় ঔষধ রাখা হয়েছে। অপারেশন থিয়েটারে নিরবচ্ছিন্ন আলো দেয়ার জন্য জেনারেটর কেনা হয়েছে। আমার মাথার উপরে লাগানো হয়েছে বড় একটা মখমলের কাপড় দিয়ে তৈরি টানা পাখা। পাখা টানার জন্য একজন পাখাল রাখা হয়েছে। কলকাতা থেকে আনা হয়েছে চারজন প্রশিক্ষিত নার্স। সুজনপুরের

মানুষের চিকিৎসা সেবা দিতে দিতে আমার যে কতটা সময় চলে গেলো বুঝতে পারিনি।

জমিদার বাবুকে একদিন বললাম, এখন আমার এফসিপিএস করার জন্য বিলাত যাওয়া প্রয়োজন। তিনি বললেন, আমি কাল কলকাতা যাবো। সেখান থেকে একজন ভালো ডাক্তার নিয়ে আসবো। ডাক্তার আসার পর তুমি বিলাত যাবে।

আজ সকালে রানার আমার হাতে একটা চিঠি দিলেন। চিঠিটা লন্ডন থেকে এসেছে। লিখেছে সুস্মিতা। চিঠিটা খুলে এক নিশ্বাসে পড়ে দেখলাম। চিঠিতে লেখা,

প্রিয় আবু বকর,
বাবজানকে দেখে তোমার দ্রুত বিলাত ফিরে আসার কথা। জেনে খুশি হবে এর মধ্যে আমার এমবিবিএস শেষ হয়েছে। আগামী সপ্তাহে ইন্টার্ন শেষ করবো। অনেক ব্যস্ততার মাঝে বিলাতের আনাচে কানাচে আমি শুধু তোমাকেই খুঁজে বেড়াই। আমার এক চোখ বিলাতের হাজার হাজার মানুষকে দেখে। আর এক চোখ শুধু তোমাকে খুঁজে বেড়ায়। তুমি ছাড়া আমার জীবনটা অসম্পন্ন। একথা নিশ্চয় তুমি উপলব্ধি করতে পেরেছো? পত্র পাওয়ার পর তাড়াতাড়ি চলে আসবে। আমি তোমার সাথেই আমার জীবনের বাকি পথ পাড়ি দিতে চাই। আমার চলার শক্তি একমাত্র তুমি। ভালো থেকো। আশা করি আমাদের খুব সহসাই দেখা হবে।
ইতি
সুস্মিতা

এর মধ্যে বাবজানের কাছে প্রতিদিন খবর নেই জমিদার বাবু এসেছেন কি না। বাবজান বলেন, অনেকদিন পর বড়দার বাড়িতে গেছেন, এজন্য দেরি হচ্ছে। এছাড়াও অজপাড়া গাঁয়ে কোনো ডাক্তার আসতে চান না। ডাক্তার পেতে হয়তো সময় লাগছে। আমি অপেক্ষা করছি জমিদার বাবুর ফিরে আসার। এর মধ্যে রানার আমার হাতে আরো একটা চিঠি তুলে দিলেন। লন্ডন থেকে সুস্মিতা লিখেছে,

চিঠিতে সামান্য ক'টি শব্দ,

প্রিয় আবু বকর,
লন্ডনের নটিংহিলে আমার বলিদানের আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। এই আয়োজন ফেরানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাসকে এভাবে নষ্ট করে দেবে আমি কখনও ভাবি নাই।
ইতি
সুস্মিতা

আমি সুজনপুর বসে সুস্মিতার প্রকৃত পরিস্থিতি আন্দাজ করতে পারছি না। তবে, ধারণা করছি ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমি বাবজানকে বললাম, বাবজান আমি উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাত যাবো। বাবজান বললেন, জমিদার বাবু ডাক্তার নিয়ে ফেরার পর গেলে ভালো হয়। আমি বললাম, এমনিতেই দেরি হয়েছে। আর দেরি করলে এফসিপিএস ভর্তি হতে পারবো না। বাবজান বললেন, ঠিক আছে, তুমি চলে যাও।

আমি তেজগাঁ বিমান বন্দর থেকে ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজে লন্ডনের পথে যাত্রা করলাম। তেজগাঁ হয়ে দুবাই এরপর লন্ডন তের চৌদ্দ ঘণ্টার যাত্রাকে আমার মনে হচ্ছে তেরো চৌদ্দ বছর। হিথ্রো বিমান বন্দরে প্লেন থেকে নেমে নটিংহিলের বাসায় ঢুকতেই দাদা বাবু বললেন, এই যে আবু বকর। কেমন আছো? আমি বললাম, ভালো। আমার উত্তর শোনার পর দাদাবাবু বললেন, কয়েক সপ্তাহ আগে সুজনপুর থেকে কলকাতা হয়ে বাবা মা বিলাত এসেছিলেন। বাবা-মাকে আমি আগেই জানিয়েছিলাম বালিয়াটির জমিদার রায় বাহাদুর গোবিন্দ রায় চৌধুরীর ছেলে চৌধুরী উপেন্দ্র রায় চৌধুরী সুস্মিতাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছে।

শুরুতে সুস্মিতা বিয়েতে রাজি ছিলো না। বারবার বলেছিলো ও এফসিপিএস করে তারপর বিয়ে করবে। বাবা-মার পীড়া-পীড়িতে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে রাজি হয়। বিয়ের পরপরই ওরা দুজনে দক্ষিণ আমেরিকার একটা স্পেশালাইজ হাসপাতালে চাকরি নিয়ে চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে চলে গেছে। তিনি আরো বললেন, চিলি স্পানিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নের জন্য নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে। দীর্ঘ পরাধীনতার শৃঙ্খলে থাকায় সেখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তৈরি হয় নাই। চিলি গভর্মেন্ট উচ্চতর বেতন নির্ধারণ করে ওদের দুজনকে নিয়ে গেছে। দাদা বাবুর কথা শুনে আমার মনে হলো সবকিছুর পেছনে হয়তো দাদাবাবুর হাত আছে। উনি যখন বুঝতে পেরেছেন সুস্মিতা আর আমার মধ্যকার সম্পর্কের কথা। হয়তো তখনই তিনি সুজনপুর পাঠানোর জন্য বাবজানের অসুস্থতার কথা বলে আমাকে সুজনপুর পাঠিয়েছেন। জমিদার বাবু কালিকুমার রায় চৌধুরী কলকাতায় যেয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সুস্মিতার বিয়ের। আমার আর একবিন্দুও লন্ডন থাকতে মন টানছে না। রাতটা কোনোভাবে কাটিয়ে পরের দিন ভিসা লাগিয়ে টিকিট সংগ্রহ করে লন্ডনের গেটওয়ে বিমান বন্দর থেকে চিলির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

সন্ধ্যায় চিলির রাজধানী সান্তিয়াগো নামলাম। এবার এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে কোথায় যাবো সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। একটা হোটেলে আশ্রয় নিয়ে রাত্রি কাটালাম। সকালে শহরের রাস্তা ধরে সুস্মিতাকে খুঁজতে বের হলাম। চিলি একটা অদ্ভুত শহর। এখানকার লোকজন শুকনা খাবারের প্রতি অনুরক্ত। বিশেষ করে নানা রকম পাউরুটি এদের তিন বেলার খাদ্য। গলিতে গলিতে রয়েছে বার। সব বারেই ওয়াইন পরিবেশনের কাজ করে মেয়েরা। রাস্তায় কাউকে পেলেই জিজ্ঞেস করি স্পেশালাইজ হাসপাতালের কথা। সবাই স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে কেউ আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলাম, সেও কিছু বলতে পারলো না। ইংরেজি বললে সে সেটাকে স্প্যানিশ ভাষায় ট্রান্সলেট করে পরে উত্তর দেয়। এখানকার কাউকে দিয়ে কাজ হবে না। তৃতীয় দিন সান্তিয়াগো শহরের পূর্ব থেকে পশ্চিম দিক চষে বেড়ালাম। খুঁজে বেড়ালাম এশিয়ার যে কোনো নাগরিককে। কাউকে পেলাম না। হাঁটাহাঁটি করে আমি বেশ পরিশ্রান্ত। হাঁটার শক্তি আমি হারিয়ে ফেললাম। আনমনে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটা চলন্ত বাস আমাকে ব্যাড়ি মেরে ফেলে দিলো। এরপরের ঘটনা আমার জানা নাই।

চোখ খুলে দেখলাম আমি হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। আমার জ্ঞান ফেরার পর ডাক্তার আমাকে বললেন, আমার নাম উপেন্দ্র রায় চৌধুরী। আপনি সান্তিয়াগোর রাস্তা দিয়ে আনমনে হাঁটছিলেন। পেছন থেকে একটা বাস আপনাকে বাড়ি মেরে ফেলে দিয়েছিলো। আপনার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছিলো আপনি জিহ্বায় কামড় দিয়ে পড়ে ছিলেন। এ বাসে দুইজন লেডি ডক্টর আপনার বুকে চাপাচাপি করে মুখে বার বার ফু দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হওয়ার পর নোয়াখালীর মি. সানেল এবং পাঞ্জাবের মি. তাকভিম নামে দুইটি ছেলে অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করে আপনাকে এই হাসপাতালে ভর্তি করেছে। আপনার মাথার পেছনে মারাত্মক জখম হয়েছে। আমরা সেখানে চৌদ্দটা সেলাই দিয়েছি। এক্সরে করে দেখেছি আপনার পাঁজরের পাঁচটা হাড় ভেঙে গেছে। দুই হাত আর দুই পায়ে মারাত্মক আঘাত লেগেছে। তিনদিন পর আজ আপনার জ্ঞান ফিরে এসেছে। এখন আপনি কেমন বোধ করছেন?

আমি ডাক্তারকে বললাম, আপনার গ্রামের বাড়ি বালিয়াটি আর আমার সুজনপুর। আপনি লন্ডন থেকে এফআরসিএস পাস করেছেন। আপনি লন্ডনের যে কলেজ থেকে এফসিপিএস করেছেন আমিও সেই কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেছি। আমার কথা শুনে ডা. উপেন্দ্র রায় চৌধুরী আমার বেডের পাশে বসলেন। অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকয়ে থাকার পর এক সময় বললেন, আপনার নাম কি আবু বকর? আমি বললাম, জী। এরপর ডা. উপেন্দ্র রায় চৌধুরী বললেন, সানেল এবং তাকভিম আপনাকে যখন এই হাসপাতালে নিয়ে আসে তখন সুস্মিতা আপনাকে প্রথম আবিষ্কার করে। আমি আমার চেম্বারে বসে ছিলাম। সুস্মিতা দৌড়ে আমার চেম্বারে যেয়ে আমাকে বলল, এশিয়ার একটা ছেলে এক্সিডেন্ট করেছে।

ইমারজেন্সিতে আমি ওকে দেখেছি। মাথায় মারাত্মক আঘাত লেগেছে। মনে হয় ব্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। একটু চেষ্টা করলে বেঁচে যেতে পারে। এরপর সুস্মিতা অনুরোধ করলো আপনার অপারেশন যেন আমি নিজ হাতে করি। সুস্মিতার অনুরোধে তখনই আপনার মাথায় সেলাই করি। আর একটু বেশি আঘাত পেলে মগজ বেরিয়ে যেতো। তখন হয়তো আপনাকে বাঁচানো যেতে না।

আপনার অপারেশনের পর একটানা তিনদিন সুস্মিতা হাসপাতালে ছিলো। আমি প্রতিদিন ওকে জিজ্ঞেস করি, ছেলেটি কে? ও কোনো কিছু বলে না। আজ সকালে বলেছে আপনার নাম আবু বকর। লন্ডনে আমার বিয়ে হওয়ার পর, বাসররাতেই সুস্মিতা আমাকে বলেছিল, বিয়েতে ও রাজি ছিলো না। বাবা মা আর দাদা জোর করে ওর বিয়ে দিয়েছে। কারণ, আবু বকর নামে এক যুবককে সে পছন্দ করে। বাবা-মা কোনোভাবেই আবুবকরের সাথে মেয়ের বিয়ে দেবে না। সবচেয়ে বড় বিষয় ধর্মীয় বৈসাদৃশ্য। যা এ সমাজ ব্যবস্থা কোনোভাবেই মানবে না।

সুস্মিতা আরো বলেছিলো, তাদের পছন্দের বিষয়টা যখন বিস্তৃত হচ্ছিল, শুরুতে টের পেয়েছিলেন কাকিমা। তিনি দু'জনকে আলাদা করতে আবু বকরের লন্ডনে এমবিবিএস পড়ার ব্যবস্থা করেন। সুস্মিতা নাছোড়বান্দা সেও লন্ডনে এমবিবিএস পড়ার বায়না ধরে। দাদা বাধ্য হয়ে ওর ভর্তি অন্য মেডিকেল কলেজে করেছিলেন এবং হোস্টেলে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। সুস্মিতার সম্পর্ক যখন গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিলো দাদা আবু বকরকে লন্ডন থেকে সুজনপুর হাসপাতালে চাকরির জন্য পাঠিয়েছিলেন। যদিও আবু বকরের বাবজানের অসুস্থতার খবরটি ওকে সুজনপুর যেতে বাধ্য করেছিল। এরপর সবকিছু দাদার পরিকল্পনা মতোই হয়েছিল। দাদা ভালো করেই জানতেন তুমি একদিন লন্ডনে ফিরে আসবেই। এজন্য তিনি চিলির স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্যাথেসির বুনসালেকে ম্যানেজ করে আমাদের চিলির স্পেশালাইজ হাসপাতালে এই চাকরির ব্যবস্থা করেন।

সুস্মিতাকে আপনি এতবেশি পছন্দ করেন আমি বুঝতে পারিনি। ওকে পাওয়ার জন্য আপনি পাড়ি দিয়েছেন লম্বা পথ। একথা সত্যি যে, সুস্মিতা অপূর্ব সুন্দর একটা মেয়ে। ওকে কেউই অপছন্দ করবে না কিন্তু ওর জন্য এতো কষ্ট হয়তো আর কেউ করতে পারবে না। আমি সুস্মিতাকে ভীষণ পছন্দ করি। কিন্তু আপনার মত হয়তো ওকে ভালোবাসতে পারিনি।

আজ সকালেই সুস্মিতাকে বলেছি, আবু বকরকে ভালোবাসার জন্য এতো বেশি পরীক্ষা দিতে হয়েছে, তবুও সে তাঁর ভালোবাসার মানুষটিকে কেন পাবে না?

সুস্মিতা আমার এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারেনি। আমি ওকে বলেছি সুস্মিতা তোমার মন চাইলে তুমি ওর সাথে তোমার গ্রাম সুজনপুরে যেতে পারো। আমি এ ব্যাপারে তোমাকে সব রকমের সাহায্য করবো। সুস্মিতা আমার কথা শুনে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলো, মুখে কিছু বলেনি।

ডা. উপেন্দ্র চৌধুরীর কথাগুলো শুনে আমার মনে হলো, তিনি খুবই ভালো একজন মানুষ, বড় মনের একজন মানুষ। তিনি চাইলে সুস্মিতার প্রতি চরম পরিশোধ নেয়ার জন্য ওকে মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে অত্যাচার করতে পারতেন। গালমন্দ করতে পারতেন। এও বলতে পারতেন তোমার মত অসুস্থ মনের মানুষ আমি কখনও দেখি নাই। যে সামান্য প্রজার সাথে নিজেকে জড়াতে পারে। এসব তিনি কিছুই বলেন নাই। বরং সুস্মিতার অনুরোধে আমার অপারেশন করেছেন নিজ হাতে। সুস্মিতাকে অভয় দিয়েছেন আমাকে ফিরে পাবার।

এখন মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আজো কিছু ভালো মানুষ আছে। উপেন্দ্র বাবুর কথা শেষ হওয়ার পর আমি বললাম, সান্তিয়াগো না আসলে হয়তো আমি একজন সত্যিকারের ভালো মানুষকে দেখতে পেতাম না। শুধু না পাওয়ার যন্ত্রণা নিয়ে জীবনের বাকি অংশ কাটাতাম। সান্তিয়াগো আমাকে না পাওয়ার মাঝেও পাওয়ার আনন্দ দিয়েছে।

উপেন্দ্র বাবু বললেন, মি. প্যাথেসির বুনসালে চিলির স্বাস্থ্যমন্ত্রী আপনাকে দেখতে আজ হাসপাতালে আসবেন। একজন ডাক্তার সে সময় উপস্থিত থাকবেন। উপেন্দ্র বাবু চলে যাবার পর ভাবলাম কি করে একজন মানুষ এতো ভালো হতে পারে?

যখন ভিজিটর আওয়ার শুরু হলো ঠিক তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাকে দেখতে এলেন। একজন ডাক্তার উনাকে আমার শারীরিক অবস্থা বর্ণনা করলেন। মন্ত্রী শুধু আমাকে বললেন How feel? আমি বললাম, Quite normal. তিনি Ok. বলে চলে গেলেন।

আজ সকাল থেকে দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সকাল ৮.০০টার দিকে সুস্মিতা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কেমন আছো? আমি সুস্মিতাকে দেখে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ভেঙে একসময় বললাম, এখন ভালো আছি।

এরপর সুস্মিতাকে বললাম, তুমি কেমন আছো? সুস্মিতার কণ্ঠ তখন বেশ ভারি। শুধু বলল, ভালো আছি। ভালো লাগছে এই ভেবে আমাকে পাওয়ার জন্য তুমি সান্তিয়াগোর মত একটা অজানা শহরে ছুটে এসেছো। তোমার এ ভালোবাসার মূল্য আমি কীভাবে পরিশোধ করবো?

সুস্মিতাকে বললাম, তুমি সারাজীবন আমাকে মনে রাখবে এটাই আমার প্রাপ্তি। শুধু পাওয়ার মাঝেই মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। দানের মাঝেও আছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি। আমার কথা শুনে সুস্মিতা বলল, উপেন্দ্র বাবু খুব ভালো একজন মানুষ। তোমার সাথে আমার সম্পর্কের কথা শুনেও আমাকে কখনও বিষয়টি নিয়ে উত্যক্ত করেন নাই। বরং তোমার কাছে যাওয়ার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেছে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন। এমন একজন ভালো মানুষকে কীভাবে ঠকাই?

সুস্মিতার কথাগুলো শুনে মনে হলো ডা. উপেন্দ্র নাথ চৌধুরীকে সুস্মিতা আস্তে আস্তে পছন্দ করতে শুরু করেছে। সুস্মিতার জীবনের ঘটে যাওয়া সব ঘটনা প্রবাহ সহজ ভাবেই তিনি মেনে নিয়েছেন। এমন একজন মানুষকে কি করে কষ্ট দেই? সুস্মিতাকে বললাম, কাল আমি চলে যাবো। উপেন্দ্র বাবু স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করে প্লেনে আমার জন্য স্পেশাল আসনের ব্যবস্থা করেছেন। সুস্মিতা বলল, যাওয়ার আগে আমার বাসায় একবার যাবে না? দেখবে না আমার সংসারটা কেমন করে সাজিয়েছি? আমি বললাম, বাসের ধাক্কায় আমার পায়ে ও হাতে আঘাত পেয়েছি। পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে পাঁচটা। আমি কী করে তোমার বাসায় যাবো? সুস্মিতা বলল, আমি হুইল চেয়ারে করে তোমাকে নিয়ে যাবো।

বিকেলে সুস্মিতা হুইল চেয়ারে আমাকে নিয়ে হাসপাতালের পাশেই ওর বাসায় নিয়ে গেলো। বসার ঘরে ঢুকেই দেখলাম তিনটি ছবি দেয়ালে লাগানো আছে প্রথমটা ডা. উপেন্দ্র চৌধুরী, দ্বিতীয় সুস্মিতা এবং তৃতীয়টি আমার। সুস্মিতাকে বললাম, দেয়ালে লাগানো আমার ঐ ছবিটা খুলে ফেলো। তোমার যখন ছেলে মেয়ে হবে তারা জিজ্ঞেস করলে কি বলবে? সুস্মিতা এর কোনো উত্তর দিলো না। আমি বললাম, আমি তোমার হৃদয়ের কোনো এক কোণে সারা জীবন থাকতে চাই, দেয়ালে না। সুস্মিতা আচ্ছা বলে আমার জন্য স্যুপ আর চা তৈরি করে আনলো।

সুস্মিতাকে বললাম, কাল সকালে আমার ফ্লাইট। এখন আমি যেতে চাই। আমার কথা শুনে সুস্মিতা আমাকে হাসপাতাল পর্যন্ত এগিয়ে দিলো।

সকালে আমি অ্যাম্বুলেন্সে করে সান্তিয়াগো বিমান বন্দরে গেলাম। বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ আমার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে আমার জন্য হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করেছে। ইমিগ্রেশন পার হওয়ার সময় বিদায় অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আসা লোকজনের মাঝে দেখতে পেলাম সুস্মিতা দাঁড়িয়ে আছে। অনেকদিন পর সুস্মিতাকে আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি দিয়ে আমাকে হাত তুলে বিদায় জানাতে দেখলাম।

আমি বিমানের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ও দেখলাম সুস্মিতা দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকক্ষণ পর বিমান সান্তিয়াগোর মাটি থেকে আকাশে উড়তে শুরু করলো। পড়ে রইলো তিল তিল করে গড়ে ওঠা আমার ভালোবাসার তাজমহল সুস্মিতা।

আমি বিমানের ছোট জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শুধু বললাম, গুড বাই সুস্মিতা, গুড বাই সান্তিয়াগো।